বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০:
একুশ শতকের বাংলাদেশ

(সংক্ষিপ্ত সার)

ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য বর্তমান প্রজন্মের শ্রেষ্ঠ উপহার

সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ (জিইডি)
বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০:
একুশ শতকের বাংলাদেশ

(সংক্ষিপ্ত সার)

ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য বর্তমান প্রজন্মের শ্রেষ্ঠ উপহার

সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ (জিইডি)
বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অক্টোবর ২০১৮

বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০:
একুশ শতকের বাংলাদেশ

(সংক্ষিপ্ত সার)

প্রকাশনা
সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ (জিইডি)
বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন
শেরেবাংলা নগর, ঢাকা ১২০৭
বাংলাদেশ
www.plancomm.gov.bd

গ্রন্থস্বত্ব: সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন

প্রকাশকাল: অক্টোবর ২০১৮
সংখ্যা: ১৫০০

মুদ্রণ
টার্টল, ৬৭/ডি গ্রীণরোড, ঢাকা

আগামী ১০০ বছরে বাংলাদেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনাই বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০। ২১০০ সালে বাংলাদেশকে যেভাবে গড়তে চাই সেভাবেই আমরা ব-দ্বীপ পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছি।

- শেখ হাসিনা

বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০: একুশ শতকের বাংলাদেশ

ক. প্রাক কথা

গত এক দশকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গতিশীল নেতৃত্বে উন্নয়ন কার্যক্রম যথেষ্ট বেগবান হয়েছে। ফলে উন্নয়ন ধারাবাহিকতায় অত্যন্ত শক্তিশালী এ সূচকগুলোর অর্জন বাংলাদেশকে আরও বেশি উন্নত লক্ষ্য নির্ধারণের জন্য অনুপ্রাণিত করেছে। ফলে, বাংলাদেশ ২০৩০ সালের মধ্যে উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশে (Upper Middle Income Country-UMIC) উন্নীত হওয়ার আকাংখা পোষণ করছে। সুচিন্তিত ও কার্যকর উন্নয়ন নীতি এবং শ্রমের ব্যাপক সরবরাহ, উর্বর জমি এবং প্রচুর পানি ও মৌসুমী বৃষ্টিপাত ছিল অতীত অর্জনের ভিত্তি। বিশ্বের বৃহত্তম ব-দ্বীপ হিসেবে বাংলাদেশ বিপুল ও ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার দেশ হলেও দেশের রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও নীতিনির্ধারকগণ উন্নয়ন পরিকল্পনায় এটিকে সুযোগ হিসেবে কাজে লাগিয়েছেন। তারপরও, এ ব-দ্বীপের গঠনগত বৈশিষ্ট্য এবং জনসংখ্যার আধিক্য উন্নয়নের পথে চ্যালেঞ্জ হিসেবে উপনীত হয়েছে। নদীসহ ১,৪৭,৫৭০ বর্গ কিলোমিটার আয়তনের প্রায় ১৬ কোটি মানুষের এ দেশে প্রতি বর্গ কিলোমিটারে প্রায় ১২০০ লোক বসবাস করে, যা বাংলাদেশকে পৃথিবীর সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ দেশগুলোর মধ্যে একটি হিসেবে পরিচিতি দিয়েছে। ব-দ্বীপের গঠন, নদীর গতিপথ ও জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ঝুঁকিপূর্ণ দেশ হিসেবে বাংলাদেশ বিশ্বে ৬ষ্ঠ স্থানে রয়েছে। জলোচ্ছ্বাস, লবণাক্ততা, বন্যা, নদী-ভাঙ্গন, ভূমিকম্প ও ঘূর্ণিঝড় দেশের নিয়মিত চিত্র, যা খাদ্য নিরাপত্তা ও গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর একটি বড় অংশের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা দিয়েছে। ব-দ্বীপ সংক্রান্ত সমস্যাগুলো সামগ্রিক সমস্যার একটি অংশ মাত্র। ক্রমবর্ধমান নগরায়ন, চাষযোগ্য জমির পরিমাণ ক্রমাগতভাবে হ্রাস পাওয়া, অবকাঠামোর স্বল্পতা, নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ এবং দক্ষ শ্রমিকের অভাবসহ অন্যান্য অনেক সমস্যার মুখোমুখি হতে হচ্ছে এ দেশকে। সীমিত সম্পদ এবং সীমাবদ্ধ সরকারি খাতের সাথে অন্যান্য চ্যালেঞ্জগুলোর সংযোগ নিম্ন মধ্যম আয়ের বাংলাদেশের নীতি ও প্রাতিষ্ঠানিক সীমাবদ্ধতার পরিচয় বহন করে। অতীতের উন্নয়ন পরিক্রমা হতে প্রতীয়মান হয় যে, দৃঢ় সংকল্প ও প্রচেষ্টার মাধ্যমে এ চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবেলা করার সামর্থ্য বাংলাদেশের রয়েছে।

জলবায়ু পরিবর্তন ও প্রাকৃতিক দুর্যোগজনিত ঝুঁকির কারণে কাঙ্খিত উন্নয়নের দীর্ঘমেয়াদি চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সরকার 'বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০' নামে একটি মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে। পানি, জলবায়ু, পরিবেশ ও ভূমির টেকসই ব্যবস্থার দীর্ঘমেয়াদি চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবেলা করে ২০৩০ সালের মধ্যে উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশের মর্যাদা অর্জন এবং চরম দারিদ্র্য দূরীকরণসহ ২০৪১ সালের মধ্যে একটি সমৃদ্ধ দেশের মর্যাদা অর্জনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ বাংলাদেশের স্বল্প ও মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনাসমূহের সমন্বয় করবে। বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ প্রাথমিকভাবে ২০৫০ পর্যন্ত মধ্যমেয়াদি ডেল্টা এজেন্ডা ঘিরে প্রণীত হলেও, তাতে ২০৫০ পরবর্তী দীর্ঘমেয়াদি এজেন্ডার বিষয়েও আলোকপাত করা হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে, এটি একুশ শতকের শেষ নাগাদ বাংলাদেশ ব-দ্বীপ বিবর্তনের জন্য একটি দীর্ঘমেয়াদি রূপকল্প নির্ধারণ করলেও, তা অর্জনের জন্য স্বল্প ও মধ্যমেয়াদি অভীষ্ট (Goal) স্থির করা প্রয়োজন। এ সকল অভীষ্ট, সহায়ক কৌশল, নীতি, প্রতিষ্ঠান এবং বিনিয়োগ একদিকে যেমন সময়ের সাথে পরিবর্তনশীল, তেমনি অন্যদিকে দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্য অর্জনের পথে এগিয়ে চলা ও ঘটনা প্রবাহের সাথে সঠিকভাবে সাড়া দানের ক্ষেত্রেও পরিবর্তিত হয়। এ প্রেক্ষাপটে, নেদারল্যান্ডসের ডেল্টা ব্যবস্থাপনার অভিজ্ঞতার আলোকে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত উত্তম চর্চা (Best Practice) অনুসরণে বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ প্রণয়নে নেদারল্যান্ডস্ সরকারের সার্বিক সহায়তা গ্রহণ করা হয়েছে। নেদারল্যান্ডস্ ও স্থানীয় বিশেষজ্ঞদের সহযোগিতায় বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশনের সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ (জিইডি) বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ প্রণয়ন করেছে।

খ. পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনায় সমন্বিত পরিকল্পনার (ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০) প্রয়োজনীয়তা

১৯৬০ সাল থেকে শুরু করে এ যাবত বাংলাদেশে পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনা ও কৃষি উন্নয়নে বেশ কিছু উদ্যোগ ও পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। অধিকন্তু সরকার জাতীয় পর্যায়ে কৌশলগত পরিকল্পনা, যেমন পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও প্রেক্ষিত পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে। ১৬৯টি লক্ষ্যমাত্রার ১৭টি টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDGs) নামে বিশ্বব্যাপী সম্প্রতি গৃহীত নতুন এজেন্ডা অর্জনে বাংলাদেশ সরকার দৃঢ় অঙ্গীকারবদ্ধ। জলবায়ু পরিবর্তন এবং ভবিষ্যতের প্রয়োজন বিবেচনায় ফলপ্রসু বাস্তবায়নকে গুরুত্ব দিয়ে এ সকল খাতভিত্তিক, জাতীয় ও বৈশ্বিক লক্ষ্য এবং পরিকল্পনাসমূহকে দীর্ঘমেয়াদি সংহত কৌশলের সাথে সমন্বয় করাই হচ্ছে এখন দেশের জন্য প্রধান চ্যালেঞ্জ।

সাধারণত খাতভিত্তিক পরিকল্পনা তুলনামূলকভাবে স্বল্পমেয়াদি এবং তা কেবল সংশ্লিষ্ট প্রণয়নকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থাসমূহ অনুসরণ করে থাকে। তবে জলবায়ু পরিবর্তন ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ সংক্রান্ত ঝুঁকি অর্থনীতির বিভিন্ন খাতসহ জাতীয় পর্যায়ের অভীষ্ট এবং লক্ষ্য অর্জনে প্রধান বাঁধা ও অনিশ্চয়তা হিসেবে দেখা দিয়েছে। এ অনিশ্চয়তা মোকাবেলায় একটি দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা এবং বহু-খাতভিত্তিক সমন্বিত নীতিমালার প্রয়োজন। উদাহরণস্বরূপ, ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা এবং কৃষি জমি হ্রাসের পাশাপাশি জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে খাদ্য নিরাপত্তা বজায় রাখার জাতীয় চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় কৃষি, পরিবেশ ও বন, ভূমি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ, পানিসম্পদ, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়, নৌ-পরিবহন, খাদ্য, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ, অর্থ ও পরিকল্পনা প্রভৃতি মন্ত্রণালয়ের নীতিগত পদক্ষেপের মধ্যে সমন্বয় সাধন অপরিহার্য। একইভাবে, জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন এবং দুর্যোগ পরবর্তী বাসস্থান ও শিল্পে বিনিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পানির চাহিদা পূরণে সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয় ও সরকারি সংস্থার অংশগ্রহণে দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্য স্থির করে সমন্বিত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন জরুরি হয়ে পড়েছে।

জলবায়ু পরিবর্তন এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ফলে সৃষ্ট অনিশ্চয়তার কারণে বিশ্বের সকল ব-দ্বীপ অঞ্চলে অভিযোজনভিত্তিক কৌশলগত পরিকল্পনা গ্রহণ করা হচ্ছে। এক্ষেত্রে গতানুগতিক কৌশল গ্রহণের পরিবর্তে জ্ঞানভিত্তিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার মাধ্যমে শক্তিশালী অথচ নমনীয় কৌশল এবং পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন, যা নীতি নির্ধারক এবং অংশীজনকে প্রত্যাশিত এবং উপযুক্ত বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করবে। আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতার আলোকে ভবিষ্যতের সম্ভাব্য পরিবর্তন কিংবা সময়ের সাথে সাথে নতুন তথ্য বা নীতিগত অগ্রাধিকারের পরিবর্তনসমূহকে বিবেচনায় রেখে ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ প্রণয়ন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে শুধুমাত্র স্বল্পমেয়াদি 'ট্রায়াল এন্ড এরর' কার্যক্রমের ওপর গুরুত্ব দেয়ার পরিবর্তে স্বল্পমেয়াদি 'নো রিগ্রেট' বা 'কোন অনুশোচনা নয়' কৌশলকে প্রাধান্য দিয়ে দীর্ঘমেয়াদি দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে ব-দ্বীপ ব্যবস্থাপনাকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

গ. ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ এর বিশ্লেষণী কাঠামো

বাংলাদেশ ব-দ্বীপের বিভিন্ন সংজ্ঞা হতে পারে। এ মহাপরিকল্পনায় ব-দ্বীপের সবচেয়ে যথাযথ সংজ্ঞা অনুসরণ করা হয়েছে, যাতে মূলতঃ বাংলাদেশের প্রায় সকল জেলা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এ সকল জেলা সমুদ্র উপকূল বা মোহনা, বড় বড় নদীসংলগ্ন বা খরাপ্রবণ এলাকা হওয়ায় তাদের প্রত্যেককে আবহাওয়া এবং জলবায়ু পরিবর্তনের বিভিন্ন ঝুঁকি মোকাবেলা করতে হচ্ছে। তবে ছয়টি জেলা (গাজীপুর, ঝিনাইদহ, মাগুরা, ময়মনসিংহ, নীলফামারী এবং শেরপুর) সমুদ্র ও প্রবাহমান নদীগুলো থেকে অবস্থানগত দূরত্বের কারণে তুলনামূলকভাবে জলবায়ু পরিবর্তন ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের জন্য কম ঝুঁকিপূর্ণ হওয়ায় এবং তেমন কোন অস্বাভাবিক পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সংকটের সম্মুখীন হচ্ছে না। ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ মূলত: একটি অভিযোজনভিত্তিক কারিগরি এবং অর্থনৈতিক মহাপরিকল্পনা, যা উন্নয়ন ফলাফলের ওপর পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনা, ভূমি ব্যবহার, প্রতিবেশ এবং জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব এবং এদের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াকে বিবেচনা করে প্রণয়ন করা হয়েছে। তাই, ব-দ্বীপ

পরিকল্পনা ২১০০ তে অঞ্চলভিত্তিক পরিকল্পনা প্রণয়নে সে অঞ্চলের পানি বিজ্ঞান ও এর ব্যবস্থাপনা (Hydrology) প্রধান ভূমিকা পালন করেছে। দেশের আটটি হাইড্রোলজিক্যাল অঞ্চলকে ভিত্তি হিসেবে ব্যবহার করে প্রতিটি অঞ্চলের প্রাকৃতিক দুর্যোগজনিত ঝুঁকির মাত্রার ওপর গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। এর ফলে একই ধরণের প্রাকৃতিক দুর্যোগজনিত ঝুঁকির সম্মুখীন জেলাসমূহকে একেকটি গ্রুপের আওতায় আনা হয়েছে, যাকে "হটস্পট" (পানি ও জলবায়ু উদ্ভূত প্রায় অভিন্ন সমস্যাবহুল অঞ্চল) হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে।

বাংলাদেশ ব-দ্বীপের হটস্পটভিত্তিক এ বিভাজনে অঞ্চলভেদে আর্থ-সামাজিক বৈশিষ্ট্য এবং এর সাধারণ ঝুঁকিসমূহ চিহ্নিত করা হয়েছে। এটি ঝুঁকি কাঠামো বিশ্লেষণের প্রথম পদক্ষেপ মাত্র। হটস্পট ও হটস্পট এর অন্তর্ভুক্ত জেলার মধ্যে ঝুঁকির মাত্রার তারতম্য হয়ে থাকে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে ঝুঁকি প্রোফাইল বিশদভাবে অনুধাবনের জন্য জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে বিশ্লেষণ করা হয়েছে এবং ঝুঁকি প্রোফাইল প্রণয়ন করা হয়েছে।

ছয়টি হটস্পট এবং এর অন্তর্ভুক্ত নিচে উল্লেখ করা হয়েছে। হাইড্রোলজিক্যাল কারণে কয়েকটি জেলা একাধিক হটস্পটের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

১. উপকূলীয় অঞ্চল (২৭,৭৩৮ বর্গ কিলোমিটার);
২. বরেন্দ্র ও খরাপ্রবণ অঞ্চল (২২,৮৪৮ বর্গ কিলোমিটার);
৩. হাওর এবং আকস্মিক বন্যাপ্রবণ এলাকাসমূহ (১৬,৫৭৪ বর্গ কিলোমিটার);
৪. পার্বত্য চট্টগ্রাম (১৩,২৯৫ বর্গ কিলোমিটার);
৫. নদী অঞ্চল এবং মোহনা (৩৫,২০৪ বর্গ কিলোমিটার); এবং
৬. নগর এলাকাসমূহ (১৯,৮২৩ বর্গ কিলোমিটার)।

সারণী: জেলাসমূহের হটস্পটভিত্তিক অবস্থান

হটস্পট	জেলার সংখ্যা	জেলার নাম
উপকূলীয় অঞ্চল	১৯	বাগেরহাট, বরগুনা, বরিশাল, ভোলা, চাঁদপুর, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, ফেনী, গোপালগঞ্জ, যশোর, ঝালকাঠি, খুলনা, লক্ষীপুর, নড়াইল, নোয়াখালী, পটুয়াখালী, পিরোজপুর, সাতক্ষীরা এবং শরীয়তপুর।
বরেন্দ্র এবং খরাপ্রবণ অঞ্চল	১৮	বগুড়া, চুয়াডাঙ্গা, দিনাজপুর, গাইবান্ধা, জয়পুরহাট, কুষ্টিয়া, মেহেরপুর, নওগাঁ, নাটোর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ, নীলফামারী, পাবনা, পঞ্চগড়, রাজশাহী, রংপুর, সাতক্ষীরা, সিরাজগঞ্জ এবং ঠাকুরগাঁও।
হাওড় এবং আকস্মিক বন্যাপ্রবণ অঞ্চল	৭	ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, হবিগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ, মৌলভীবাজার, নেত্রকোনা, সুনামগঞ্জ, সিলেট।
পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল	৩	বান্দরবান, খাগড়াছড়ি এবং রাঙ্গামাটি।
নদী অঞ্চল এবং মোহনা	২৯	বরগুনা, বরিশাল, ভোলা, বগুড়া, চাঁদপুর, কুমিল্লা, ফরিদপুর, ফেনী, গাইবান্ধা, গোপালগঞ্জ, জামালপুর, কুড়িগ্রাম, লক্ষীপুর, লালমনিরহাট, মাদারীপুর, মানিকগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, নাটোর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ, নোয়াখালী, পাবনা, পটুয়াখালী, রাজশাহী, রাজবাড়ী, শরীয়তপুর, সিরাজগঞ্জ, টাঙ্গাইল এবং খুলনা।
নগর এলাকাসমূহ	৭	বরিশাল, চট্টগ্রাম, ঢাকা, খুলনা, রাজশাহী, রংপুর এবং সিলেট।
অপেক্ষাকৃত কম দুর্যোগপ্রবণ এলাকা	৬	গাজীপুর, ঝিনাইদহ, মাগুরা, ময়মনসিংহ, নীলফামারী, শেরপুর।

সূত্র: বিডিপি ২১০০ বিশ্লেষণ, জিইডি, ২০১৫ এবং উপকূলীয় অঞ্চল নীতিমালা ২০০৫

ঘ. ব-দ্বীপ হিসেবে বাংলাদেশের সম্ভাবনা

ব-দ্বীপ হিসেবে বাংলাদেশের সম্ভাবনা অপার। মাটি ও পানির সংমিশ্রণ বাংলাদেশকে একটি উর্বর ভূখন্ডে পরিণত করেছে, যেখানে বছরে দুই বা ততোধিক ফসল উৎপাদিত হচ্ছে। প্রাকৃতিক এ সুযোগকে কাজে লাগিয়ে বীজ-সার-সেচ প্রযুক্তির সফল সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে বাংলাদেশে কৃষি উৎপাদন বিশেষ করে ধানের উৎপাদন ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলস্বরূপ, ১৯৭৩ সালের ১২

মিলিয়ন টন চাল উৎপাদন যা ২০১৮ সালে ৩৬.৩ মিলিয়ন টনে উন্নীত হয়েছে। সফল জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ নীতি অবলম্বনের পাশাপাশি বাংলাদেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের মাধ্যমে রপ্তানি সম্ভাবনা তৈরি করেছে। ব-দ্বীপের গঠন এবং জলবায়ু পরিবর্তন দ্বারা উদ্ভূত একাধিক ঝুঁকি সত্ত্বেও এ অসাধারণ কৃতিত্ব বাংলাদেশী সমাজের ঘাতসহিষ্ণুতার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

অসংখ্য নদ-নদী এবং জলাভূমি এ ব-দ্বীপে মৎস্য উৎপাদনে অবারিত সুযোগ সৃষ্টি করেছে। অধিকন্তু সামুদ্রিক মৎস্য দেশের মোট মৎস্য উৎপাদনের একটি উলেখযোগ্য অংশ। অতি সম্প্রতি, বঙ্গোপসাগরে বাংলাদেশের উন্মুক্ত অর্থনৈতিক অঞ্চলের আয়তন বৃদ্ধি পাওয়ায় মৎস্য সম্পদ আহরণের পরিধি আরও বিস্তৃত হয়েছে। ফলে, মোট কৃষিজ উৎপাদনে ফসলের তুলনায় মৎস্য উপখাতের অবদান দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে। ক্রমশঃ এ খাতে মূল্য সংযোজন এবং কর্মসংস্থান অনেকাংশে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

বাংলাদেশ নদীবহুল দেশ হওয়ায় নৌ-পরিবহনের ক্ষেত্রে তুলনামূলকভাবে সুবিধাজনক অবস্থানে রয়েছে। দেশের প্রায় সব জেলা একে অপরের এবং ঢাকা, চট্টগ্রাম ও খুলনার গ্রোথ সেন্টারসমূহের সাথে নদী প্রবাহের মাধ্যমে সংযুক্ত। অভ্যন্তরীণ নৌপথ দেশের যাত্রী পরিবহন বিশেষ করে গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর যাতায়াতের এবং সামগ্রিকভাবে পণ্য পরিবহনের একটি পরিবেশবান্ধব ও স্বল্পব্যয়ের মাধ্যম। এছাড়া, এ পরিবহন ব্যবস্থা গ্রামীণ কর্মসংস্থানের একটি প্রধান উৎস। নৌ-পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে একদিকে যেমন পরিবহন ব্যয় এবং পরিবেশের অবনমন হ্রাস সম্ভব অন্যদিকে তেমনি, এ খাতে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য বর্ধিত হারে কর্মসংস্থানের সুযোগ রয়েছে।

সমুদ্রে অবাধ প্রবেশাধিকার বাংলাদেশের জন্য একটি বিশাল সুযোগ। বন্দর সুবিধা ছাড়াও যথাযথ বিনিয়োগের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ ও বহিঃবাণিজ্যের চাহিদা পূরণের পাশাপাশি বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সমুদ্র পরিবহনের ক্ষেত্রে একটি আঞ্চলিক কেন্দ্র (Regional Hub) হিসাবে গড়ে উঠতে পারে। সঠিক পরিকল্পনা এবং বিনিয়োগের মাধ্যমে বাংলাদেশ এ প্রাকৃতিক সুযোগকে কাজে লাগিয়ে উন্নয়নের দ্বার আরও প্রসারিত করতে পারে। রোটরডাম, সিঙ্গাপুর এবং হংকং এর মতো ব্যস্ত সমুদ্র বন্দরগুলো এক্ষেত্রে অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত। বিগত দশকে ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের ব্যাপক বিস্তারের ফলে দেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধির উর্ধ্বগামিতা বিদ্যুতের চাহিদা ক্রমশ বাড়িয়ে দিয়েছে। অন্যদিকে প্রাকৃতিক গ্যাস মজুদের দ্রুত হ্রাসের ফলে অন্যান্য প্রাথমিক জ্বালানির অনুসন্ধানের গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। এ ক্ষেত্রে পরিচ্ছন্ন কয়লা, এলএনজি এবং এলপিজি প্রভৃতি প্রাথমিক জ্বালানীর বিপুল পণ্যসম্ভার পরিবহন করার জন্য বন্দর সুবিধা প্রয়োজন। চট্টগ্রাম ও মংলা বন্দর ছাড়াও নতুন বন্দর স্থাপনের মাধ্যমে বাংলাদেশ সমুদ্রের এ অবাধ প্রবেশাধিকার কাজে লাগাচ্ছে। পটুয়াখালীতে চলমান পায়রা বন্দর নির্মাণ এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। সমুদ্রে অবাধ প্রবেশাধিকারের ফলে বাংলাদেশের সুনীল অর্থনীতির (Blue Economy) বিকাশেও অপার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে। সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ ইতোমধ্যে অভ্যন্তরীণ খাদ্য চাহিদা পূরণ, রপ্তানি, আয় এবং কর্মসংস্থানের একটি প্রধান উৎস হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। ঐতিহ্যবাহী কক্সবাজার উপকূলীয় পর্যটনের বিকল্প হিসেবে পটুয়াখালী জেলার কুয়াকাটা পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে গড়ে ওঠেছে।

৬. ডেল্টা চ্যালেঞ্জসমূহ

১. জলবায়ু পরিবর্তন

তাপমাত্রা বৃদ্ধিঃ জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক প্যানেলের (আইপিসিসি-এআর ৫) পঞ্চম অ্যাসেসমেন্ট রিপোর্ট অনুযায়ী ১৮৮০ থেকে ২০১২ সালে বিশ্বব্যাপী ভূমি ও সমুদ্রপৃষ্ঠের সমন্বিত গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে ০.৮৫ ডিগ্রী সেলসিয়াস (০.৬৫ থেকে ১.০৬)। ১৮৫০-১৯০০ এবং ২০০৩-২০১২ সময়কালের মধ্যে মোট গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে ০.৭৮ ডিগ্রী সেলসিয়াস। ১৯০১ থেকে ২০১২ সময়কালে পৃথিবীর সর্বত্র ভূ-পৃষ্ঠের উষ্ণতা বৃদ্ধি পেয়েছে। দীর্ঘসময় ধরে এ উষ্ণতা বৃদ্ধি ছাড়াও, বিশ্বব্যাপী গড় তাপমাত্রা কয়েক দশক ধরে বেড়ে চলেছে এবং তার সাথে প্রতি বছরেই তাপমাত্রার তারতম্য লক্ষণীয়। বিশ্বব্যাপী ক্রমবর্ধমান তাপমাত্রা পরিবর্তনের ধরণ ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে বলে

প্রতীয়মান। এ সম্পর্কিত প্রাক্কলনগুলো হতে দেখা যায় ২০৪৬-২০৬৫ সময়ের জন্য গড় তাপমাত্রা ১ থেকে ১.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস বৃদ্ধি পাবে, এবং ২০৮১-২১০০ সময়ের জন্য এ বৃদ্ধির পরিমাণ হবে ১ থেকে ৩.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত।

তাপমাত্রা বাংলাদেশেও যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। ভবিষ্যতের তাপমাত্রা বৃদ্ধির মাত্রা সম্পর্কে বিতর্ক থাকলেও এ বিষয়ে ঐক্যমত রয়েছে যে বিশ্বব্যাপী উষ্ণায়নের মাত্রা বৃদ্ধির সাথে সাথে বাংলাদেশের তাপমাত্রাও বৃদ্ধি পাবে। এ মহাপরিকল্পনাতে এ বিষয়ে দু'টি পরিস্থিতিকে বিবেচনা করা হয়েছে: স্থিতাবস্থা (Business as Usual- BAU) এবং চরম দৃশ্যকল্প (Extreme scenario- EXT)। প্রথমটি গ্রীন হাউস গ্যাস (জিএইচজি) নির্গমন কমাতে টেকসই বৈশ্বিক ও জাতীয় প্রচেষ্টার মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনের একটি পরিস্থিতি বিবেচনা করে। দ্বিতীয়টি গ্রীন হাউস গ্যাস নির্গমন এবং জীবাশ্ম জ্বালানিভিত্তিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ড অবনমনে সীমিত বৈশ্বিক ও জাতীয় প্রচেষ্টা সম্বলিত চরম জলবায়ু পরিবর্তনের পরিস্থিতি বর্ণনা করে। প্রাক্কলনে দেখা যায় যে, বৈশ্বিক প্রবণতার মতোই ভবিষ্যতে বাংলাদেশের সব অঞ্চলে তাপমাত্রা বেড়ে যেতে পারে। ২০৫০ এর মধ্যে স্থিতাবস্থায় (BAU) এর মাত্রা হবে ১.৪ থেকে ১.৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং চরম দৃশ্যকল্পের ক্ষেত্রে (EXT) এর মাত্রা হবে ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এ শতাব্দীর পরের অর্ধে বিশেষ করে চরম (EXT) পরিস্থিতিতে তাপমাত্রা আরো বৃদ্ধি পেতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

বৃষ্টিপাত: বাংলাদেশে বৃষ্টিপাতের ধরণ ভবিষ্যতে আরও পরিবর্তিত এবং অনিয়মিত হতে যাচ্ছে। ধারণা করা হচ্ছে যে, স্থিতাবস্থা দৃশ্যকল্পে (BAU) প্রাক-মৌসুমী এবং মৌসুমি বৃষ্টিপাত বৃদ্ধি পাবে। বার্ষিক ভিত্তিতে, ২০৩০ সাল নাগাদ অধিকাংশ অঞ্চলে বৃষ্টিপাত বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে এবং তা অনিয়মিত হতে পারে বলে পূর্বাভাস রয়েছে। ২০৫০ নাগাদ পূর্বাঞ্চলীয় পাহাড়ী এলাকাসহ দেশের দক্ষিণ অংশে বৃষ্টিপাত হ্রাস পেতে পারে। চরম পরিস্থিতিতে (EXT) তাপমাত্রা যেহেতু আরও বৃদ্ধি পাবে, তাই বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ও আচরণ আরো পরিবর্তিত হবে।

বন্যা: বন্যার পুনরাবৃত্তি বাংলাদেশের একটি স্বাভাবিক ঘটনা। দেশের তিনটি বৃহৎ নদী পদ্মা, ব্রহ্মপুত্র এবং মেঘনা একসঙ্গে মিলিত হয়ে বিশ্বের বৃহত্তম ব-দ্বীপ সৃষ্টি করেছে। ফলস্বরূপ, পাবনভূমি ও ব-দ্বীপ নিয়ে গঠিত এ দেশের প্রায় ৭০ শতাংশ এলাকা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ১ মিটারের চেয়ে কম উঁচুতে অবস্থিত এবং ১০ শতাংশ এলাকা হ্রদ ও নদীগুলোর সমন্বয়ে গঠিত। বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে ঘন ঘন ক্রান্তীয় ঝড়সহ দেশের অন্য উঁচু এলাকাতে ভারী মৌসুমি বৃষ্টিপাত সংঘটিত হয়। এ সব ঘটনা প্রবাহে বাংলাদেশে ঘন ঘন বন্যা পরিলক্ষিত হয়। নদী প্রবাহ ও নিষ্কাশন সীমাবদ্ধতার কারণে প্রতি বছর গড়ে দেশটির প্রায় ২০-২৫ শতাংশ অঞ্চল পাবিত হয়। তিনটি প্রধান নদী (পদ্মা, ব্রহ্মপুত্র এবং মেঘনা) যখন একই সময়ে পানি প্রবাহের চূড়ান্ত অবস্থায় পৌছে তখন দেশে বন্যা পরিস্থিতির অবনতি হয়। সাধারণত, চরম বন্যার সময় দেশের ৫৫-৬০ শতাংশ অঞ্চল পাবিত হয়। সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা গেছে যে, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বড় ধরণের বন্যার মাত্রা ও পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। উজানের দেশগুলোর নদীতে বাঁধ নির্মাণ, অবৈধভাবে দখলকৃত পাবনভূমিতে অপরিকল্পিত নগরায়ণ, কাঠামোগত ও অ-কাঠামোগত পদক্ষেপ গ্রহণে সমন্বয়ের অভাব, প্রভৃতি মনুষ্যসৃষ্ট কারণে সার্বিক পরিস্থিতির অবনতি ঘটছে। গবেষণায় দেখা যাচ্ছে যে, চরম পরিস্থিতিতে (EXT) একবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে (২০৫০) দেশের সব অঞ্চলে বন্যার প্রকোপ বেড়ে যাবে। এ পরিস্থিতিতে ব্রহ্মপুত্র-যমুনার উভয় তীর বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। যমুনা নদীর বাম তীরে ভিত্তি বছরের (১৯৭৮-২০০৭) তুলনায় গড়ে ৩-৯ শতাংশ অতিরিক্ত এলাকা বন্যায় তলিয়ে যাবে। অন্যদিকে, চরম পরিস্থিতিতে (EXT) ২০৫০ এর মধ্যে যমুনা নদীর ডান তীর সংলগ্ন বরেন্দ্র অঞ্চলের কিছু অংশ (প্রায় ৩০ শতাংশ) তলিয়ে যাবে এমন পূর্বাভাস রয়েছে।

খরা: বাংলাদেশে যে খরা হচ্ছে তা আবহাওয়াজনিত খরা নয়, বরং এটি কৃষিজনিত খরা, যাকে তীব্র আর্দ্রতাহীন বলা যেতে পারে। বাংলাদেশের খরাপ্রবণ কৃষি প্রতিবেশ (Agro-Ecological) অঞ্চলসমূহে ২৪ মার্চ থেকে ২১ মে পর্যন্ত ৩২-৪৮ দিন শুষ্ক সময়। একই অঞ্চলে এ সময়ে তাপমাত্রা ৫-১৫ দিনের জন্য ৪০ ডিগ্রী সেলসিয়াসেরও বেশি হয়। তবে, বরেন্দ্র অঞ্চলের খরা মোকাবেলায়

সরকার কর্তৃক গৃহীত সেচ প্রকল্পগুলো এ অঞ্চলের চিত্র পরিবর্তন করে এটিকে বৈচিত্র্যময় কৃষিভিত্তিক (ধান, ফল ও সবজি) অঞ্চলে রূপান্তরিত করেছে। এটি এ অঞ্চলের দারিদ্র্য নিরসনে যথেষ্ট অবদান রেখেছে। তবে উজানের নদীসমূহের পানি প্রবাহের গতিপথ পরিবর্তন এবং অপর্যাপ্ত বৃষ্টিপাতের ফলে পানির স্তর নিচে নেমে যাওয়ায় খরা ঝুঁকির সময়কাল এগিয়ে আসছে। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে শুষ্ক মৌসুমে বৃষ্টিপাত আরো কমে গেলে বরেন্দ্র অঞ্চলের কৃষি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

নদী ভাঙ্গনঃ দেশের নদীগুলোর গঠন বিন্যাস অত্যন্ত গতিশীল। নদীভাঙন বিশেষ করে বর্ষাকালে প্রধান নদীগুলোর তীর ভেঙ্গে যাওয়া একটি নিয়মিত ঘটনা। বাংলাদেশের প্রধান তিনটি নদী যমুনা, পদ্মা এবং মেঘনার নিম্নভাগে ভাঙ্গন এদেশের সমগ্র নদীভাঙনের প্রতিরূপ (Proxies) হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। প্রতি বছর যমুনা এবং পদ্মার তীর যথাক্রমে প্রায় ১,৭৭০ হেক্টর এবং ১২৯৮ হেক্টর ভাঙ্গছে। এছাড়া প্রতি বছর মেঘনার নিম্নভাগে গড়ে ২৯০০ হেক্টর ভেঙ্গে যাচ্ছে। নদী ভাঙ্গনে প্রতি বছর গৃহহীন হচ্ছে ৫০ হাজার থেকে ৬০ হাজার পরিবার। অতিরিক্ত পানি প্রবাহ নদী ভাঙ্গনের একটি প্রধান কারণ। বাহাদুরাবাদ স্টেশন পয়েন্টে (ব্রহ্মপুত্র / যমুনা) গত ৫০ বছরের পানি প্রবাহ থেকে দেখা যায় যে, সর্বোচ্চ প্রবাহ ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং এ ঘটনা সময়ের আগেই ঘটছে। আগে এর গড় সময় ছিল আগস্টের মাঝামাঝি কিন্তু এখন তা আগস্ট মাসের প্রথম সপ্তাহে হচ্ছে। ভৈরব বাজার পয়েন্টে মেঘনার সর্বোচ্চ প্রবাহ কমছে এবং এটি সামান্য বিলম্বে ঘটছে। মেঘনার এ সর্বোচ্চ প্রবাহ ১৯৭০ সালের শেষের দিকের জুলাই এর মাঝামাঝি থেকে সেপ্টেম্বরের শেষ সপ্তাহে পিছিয়েছে। হার্ডিঞ্জ ব্রিজ স্টেশনে পদ্মার সর্বোচ্চ প্রবাহ ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং সময়ের আগেই তা ঘটছে। প্রতি দশকে এ সময় প্রায় একদিন করে এগিয়ে আসছে। পদ্মা ও ব্রহ্মপুত্রের ক্রমবর্ধমান প্রবাহ ভবিষ্যতে নদী ভাঙনের সম্ভাবনা বাড়িয়ে দিচ্ছে। এক্ষেত্রে ভাল দিক হল যদি প্রবাহের এ ধারা অব্যাহত থাকে, তবে পদ্মা ও ব্রহ্মপুত্র প্রবাহ হ্রাস পাওয়ার সম্ভাবনা কমে যাবে, যার ফলে বিপর্যয়কর ও দীর্ঘস্থায়ী বন্যার সম্ভাবনা হ্রাস পাবে। ভাঙ্গনের পাশাপাশি নদীর গতিপথ এবং সংশ্লিষ্ট পলি পরিবহন (sediments) থেকে ১৯৭৩-২০১৫ সময়কালে মোট ৫২,৩১৩ হেক্টর নতুন ভূমি জেগে উঠেছে। যদিও এ জেগে উঠা নতুন ভূমির পরিমাণ নদী ভাঙ্গনের ফলে ভূমি ক্ষয়ের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে কম। এক্ষেত্রে ব্রহ্মপুত্র/যমুনা নদী ভাঙ্গনের পরিমাণ সবচেয়ে বেশি। তবে জলবায়ু পরিবর্তনের বহুবিধ প্রভাবের কারণে নদী প্রবাহ ও পলি পরিবহনের ক্ষেত্রে সংঘটিত পরিবর্তন নদীগুলোর গতিশীলতাকে আরও প্রভাবিত করতে পারে।

সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি (Sea Level Rise) এবং লবণাক্ততার অনুপ্রবেশঃ বাংলাদেশ ব-দ্বীপের জটিল ভৌগলিক অবস্থানের জন্য সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি ও লবণাক্ততার অনুপ্রবেশ এখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আইপিসিসি (২০১৩) এর প্রক্ষেপণ অনুযায়ী নিম্ন থেকে উচ্চ নির্গমনের ক্ষেত্রে ২১০০ সালে বঙ্গোপসাগরের সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা ০.২ থেকে ১ মিটার পর্যন্ত বৃদ্ধি পাবে। বিশ্লেষণে দেখা যায়, চরম পরিস্থিতিতে (EXT) ২০৫০ এবং ২১০০ সালের মধ্যে উপকূলীয় অঞ্চলের মধ্যভাগে বন্যার পরিমাণ ভিত্তিবছর (২০০৫) থেকে যথাক্রমে ৬ শতাংশ এবং ৮ শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধি পাবে, যা উপকূলীয় অঞ্চলের অন্যান্য অংশগুলোর মধ্যে সর্বোচ্চ। ২০৫০ এবং ২১০০ সালের মধ্যে উপকূলীয় অঞ্চলের পশ্চিমভাগ যথাক্রমে ৫ শতাংশ এবং ৬ শতাংশ অধিক বন্যার সম্মুখীন হবে। সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতার ক্রমবর্ধমান বৃদ্ধি উপকূলীয় অঞ্চলে মিঠা পানির প্রাপ্যতায় বাঁধা সৃষ্টি করে এবং সমুদ্র হতে লবণাক্ততার অনুপ্রবেশ ত্বরান্বিত করে। উপকূলীয় সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির সাথে সাথে ভূ-পৃষ্ঠের উপরিভাগের পানির এবং মাটির লবণাক্ততা উভয়ই বৃদ্ধি পেতে পারে। প্রাক্কলন হতে দেখা যায় যে, চরম পরিস্থিতিতে (EXT) ২০৫০ সালের মধ্যে ১ পিপিটি লবণাক্ততাবিশিষ্ট এলাকা ভিত্তি বছরের (২০০৫) প্রায় ১০ শতাংশ থেকে ১৭.৫ শতাংশ এবং ৫ পিপিটি বিশিষ্ট লবণাক্ততা এলাকা ভিত্তি বছরের ১৬ শতাংশ থেকে ২৪ শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধি পেতে পারে।

ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস: উপকূলবর্তী নিচু অঞ্চলগুলো ঘূর্ণিঝড়ের জন্য অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ, যা এ অঞ্চলের জীবন ও সম্পদের জন্য গুরুতর হুমকি। দেশের উপকূলীয় অঞ্চলে প্রায় প্রতি বছরই ঘূর্ণিঝড় হয় এবং গড়ে প্রতি তিন বছরে একটি শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড় আঘাত হানে। সমুদ্র পৃষ্ঠের তাপমাত্রা (Sea Level Temparature) এবং উচ্চতা বৃদ্ধির ফলে উপকূলীয় অঞ্চলে ঘূর্ণিঝড়ের তীব্রতা ও জলোচ্ছ্বাসের পরিমাণ/মাত্রা বৃদ্ধি পাবে। আইপিসিসি'র প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে যে, গ্রীষ্মমন্ডলীয় ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে ভবিষ্যতে বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে ঝড়বৃষ্টি এবং বন্যার তীব্রতাও বৃদ্ধি পাবে। চরম পরিস্থিতিতে (EXT) ১ মিটার ও ৩ মিটারের বেশি প্লাবন গভীরতার এরুপ উপকূলীয় ঝুঁকিপ্রবণ অঞ্চলসমূহের প্লাবন ভিত্তিবছরের চেয়ে যথাক্রমে ১৪ শতাংশ এবং ৬৯ শতাংশ বেশি হবে। চরম পরিস্থিতিতে ২০৫০ সালের মধ্যে ১০ বছরের ঘূর্ণিঝড় চক্র আরো তীব্র হবে এবং এর ফলে ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার ৪৩ শতাংশ প্রভাবিত হবে, যা বর্তমানের চেয়ে ১৭ শতাংশ বেশি।

২. উজানের (Upstream) উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড

উজানের পানি প্রবাহের ওপর অধিকমাত্রায় নির্ভরশীল হওয়ার কারণে আন্তঃদেশীয় নদীর গতিপথের পরিবর্তন, পানির অধিক ব্যবহার বা ধরে রাখার কৌশল বাংলাদেশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শুষ্ক ও বর্ষা মৌসুমের পানি প্রবাহ, লবণাক্ততা, নদীতে জমাকৃত পলি এবং মেঘনা নদীর মোহনায় পলিচাপের প্রভাব বাংলাদেশের পানি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য বিষয়। এর ফলে, মেঘনার মোহনায় উপকূলীয় প্লাবনভূমি সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির উপর সরাসরি প্রভাব ফেলে। বড় নদীগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি নেতিবাচক প্রভাব পরে পদ্মার উপর, যার পরেই রয়েছে ব্রহ্মপুত্র এবং কম মাত্রায় প্রভাবিত মেঘনা নদী। সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত আঞ্চলিক নদীগুলো হল: দুধকুমার, ধরলা, তিস্তা ও মহানন্দা।

৩. পানির গুণগতমান

প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে দেখা যায় যে, ৩২টি নদীর পানির গুণগতমান বেশ খারাপ হয়েছে যা গুরুতর পরিবেশগত অবনতির ঝুঁকি হিসেবে বিবেচনা করা যায়। শিল্পায়ন, কৃষি যান্ত্রিকীকরণ, নগরায়ন ও লবণাক্ততা দেশের ভূ-পৃষ্ঠের পানির গুণগতমানের আরও অবনতি ঘটাতে পারে। পানি দূষণের অন্তত তিন ধরণের সরাসরি নেতিবাচক প্রভাব রয়েছে, যেমন: ১) গ্রামীণ ও শহরাঞ্চলের জনগণের স্বাস্থ্য সমস্যা বৃদ্ধি; ২) দূষণ ও লবণ পানির অনুপ্রবেশের ফলে কৃষি ও শিল্প উৎপাদন হ্রাস; এবং ৩) পরিবেশগত অবনতি। আর্সেনিক এবং লবণাক্ততা ভূগর্ভস্থ পানির গুণগতমানের মূল সমস্যা। শিল্প ও গৃহস্থালি উৎস থেকে সৃষ্ট দূষণও একটি স্পষ্ট ঝুঁকি। দেশের প্রায় ১২.৬ শতাংশ সরবরাহকৃত পানিতে আর্সেনিক রয়েছে।

৪. জলাবদ্ধতা

নগর এবং গ্রামীণ কিছু কিছু এলাকায় জলাবদ্ধতা একটি গুরুতর উন্নয়ন চ্যালেঞ্জ। অপরিকল্পিত এবং অকার্যকর নিষ্কাশন ব্যবস্থা, শহর ও গ্রামাঞ্চলে জলাভূমিগুলোর জোরপূর্বক দখল এবং উপকূলীয় এলাকায় বিশেষ করে দক্ষিণ-পশ্চিমে (সাতক্ষীরা, যশোর, খুলনা ও বাগেরহাট) এবং দক্ষিণ-পূর্বে (নোয়াখালী, ফেনী) জোয়ার-ভাটার স্বাভাবিক প্রবাহে বিঘ্ন সৃষ্টি ইত্যাদি কারণে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হচ্ছে।

জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব

জলবায়ু পরিবর্তনের বিভিন্ন উপাদান এ দেশের উন্নয়নে ব্যাপক ক্ষতিকর প্রভাব ফেলতে পারে। এ সকল উপাদানের দ্বারা দেশের অধিকাংশ খাত প্রভাবিত হয়ে সামগ্রিকভাবে অর্থনীতির ক্ষতি সাধন করে। এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ খাত হল কৃষি। উচ্চ তাপমাত্রা আউশ, আমন ও বোরো ধানের উচ্চ ফলনশীল জাতের ফলন হ্রাস করে। জলবায়ু পরিবর্তন, বিশেষত তাপমাত্রা, আর্দ্রতা এবং বিকিরণ কীটপতঙ্গ, রোগ-জীবাণু ও অনুজীবসমূহের বৃদ্ধি ঘটায়। সিমুলেশন গবেষণা থেকে দেখা যায় যে, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভিত্তি অবস্থার তুলনায় ধানের মোট উৎপাদনের প্রায় ১৭ শতাংশ এবং গমের উৎপাদন ৬১ শতাংশ কম হতে পারে। ধানের উৎপাদন ২০৫০ সালের মধ্যে ২০০২ সালের

তুলনায় ৪.৫ মিলিয়ন টন হ্রাস পেতে পারে। মাটির লবণাক্ততা বৃদ্ধির কারণে কৃষিও ক্ষতিগ্রস্ত হবে। ইতোমধ্যেই লবণাক্ত প্রবণ এলাকায় ধানের ফলন কমে গেছে। বিশেষত পটুয়াখালী জেলার ধানের গড় ফলন জাতীয় গড়ের চেয়ে ৪০ শতাংশ এবং নওগাঁর তুলনায় ৫০ শতাংশ কম। সহনীয় পর্যায়ের জলবায়ু পরিবর্তন দৃশ্যকল্পে (Moderate Climate change scenario) লবণাক্ততার অনুপ্রবেশের কারণে বছরে প্রায় ০.২ মিলিয়ন টন ফসল নষ্ট হতে পারে। পর্যালোচনা থেকে দেখা যায় যে, স্থিতাবস্থা (BAU) পরিস্থিতিতে ফলন হ্রাসের ফলে বার্ষিক ধান উৎপাদন ২০৫০ সালে ১.৬০ শতাংশ এবং ২১০০ সালে ৫.১ শতাংশ হ্রাস পাবে। সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধিসহ জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সৃষ্ট পুনঃপুনঃ বন্যায় কৃষিখাত আরও ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

জলবায়ু পরিবর্তনের আরেকটি ঝুঁকিপূর্ণ খাত হচ্ছে বনাঞ্চল ও প্রতিবেশ। সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা, উচ্চ তাপমাত্রা এবং ঘূর্ণিঝড়ের তীব্রতা বৃদ্ধির ফলে দেশের বন সম্পদ ক্ষতিগ্রস্ত হবে, জলবায়ু-সংবেদনশীল অনেক প্রজাতির উপর নেতিবাচক প্রভাব পড়বে এবং অনেক উঁচু বনভূমি এলাকায় মাটি ক্ষয় ও এর গুণগতমান হ্রাস পাবে। বিশ্বের বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বন, সুন্দরবন জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির ফলে লোনা পানির অনুপ্রবেশ বৃদ্ধি পাবে, যা বন ও এর বৈচিত্র্যপূর্ণ প্রতিবেশের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে।

প্লাবনের ফলে ভূমি ও ভৌত সম্পদ ক্ষতিগ্রস্ত হবে। যেমন এক মিটার সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির ফলে বাংলাদেশে স্থলভূমির একটি উল্লেখযোগ্য অংশ স্থায়ীভাবে প্লাবিত হবে, জমির পরিমাণে আশংকাজনক ঘাটতির কারণে অর্থনীতির সকল খাতে উৎপাদন হ্রাস পাবে এবং প্রকৃত জিডিপিতে অবনমন ঘটবে। স্থিতাবস্থা (BAU) পরিস্থিতিতে ২০৩০ সাল নাগাদ প্রকৃত জিডিপি প্রতিবছর ০.৭৩ শতাংশ এবং ২১০০ সাল নাগাদ ০.৯৩ শতাংশ হ্রাস পাবে। জলবায়ু পরিবর্তন এবং ফলস্বরূপ সৃষ্ট বন্যা ও ঘূর্ণিঝড় এ দেশের অবকাঠামোসমূহের উপর উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলবে। একটি প্রাক্কলন হতে দেখা যায় যে, নির্মাণ খাতে পুঁজি মজুদ বছরে ০.০৫ শতাংশ হারে হ্রাস পাবে। সড়ক অবকাঠামো খাত আরো ক্ষতিগ্রস্ত হবে। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে স্বাস্থ্যগত ঝুঁকিও বাড়বে। কেননা বিভিন্ন পানিবাহিত রোগ, যেমন ডায়রিয়া ও আমাশয়, এবং জীবানু বাহিত রোগ, যেমন ম্যালেরিয়া ও ডেঙ্গু জলবায়ু পরিবর্তনের প্রতি সংবেদনশীল। এক প্রাক্কলন অনুযায়ী ডেঙ্গু এবং ম্যালেরিয়া সংক্রান্ত রোগের প্রকোপ বাড়তে পারে।

সামষ্টিক পর্যায়ে জলবায়ু পরিবর্তনের মিলিত প্রভাবের ফলে সহনীয় জলবায়ু পরিবর্তন পরিবেশে বছরে ১.১ শতাংশ হারে এবং চরম জলবায়ু পরিবর্তন পরিবেশে বছরে ২.০ শতাংশ হারে মোট দেশজ উৎপাদন হ্রাস পেতে পারে। ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ এর জন্য প্রণীত একটি প্রাক্কলন হতে দেখা যায় সহনীয় জলবায়ু পরিবর্তন পরিবেশে ২০১৭-২০৪১ সালের মধ্যে প্রতি বছর মোট দেশজ উৎপাদনের প্রায় ১.১ শতাংশ হ্রাস পাবে। এ বিশাল নেতিবাচক প্রভাব বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ভিত্তি রচনা করেছে। প্রস্তাবিত বিনিয়োগ প্রকল্প/কর্মসূচিসহ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ বাস্তবায়ন করা হলে এর আওতায় বাংলাদেশ জিডিপি প্রবৃদ্ধি ৯.০ শতাংশে উন্নীত হবে। স্থিতাবস্থায় (BAU) নীতির তুলনায় তা প্রায় ১.৯ শতাংশ বেশি। এ প্রেক্ষাপটে ব-দ্বীপ পরিকল্পনার গুরুত্ব অপরিসীম।

জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে জনকল্যাণের উপর জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, দারিদ্র্য এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের তীব্রতার মধ্যে একটি শক্তিশালী ইতিবাচক সম্পর্ক রয়েছে। ১৬ টি জেলার মধ্যে ৭০ শতাংশ এলাকা প্রাকৃতিক দুর্যোগে সবচেয়ে বেশী ঝুঁকির (র‍্যাংকিং ১=তীব্র ঝুঁকি) মধ্যে রয়েছে। ২০১০ সালের উচ্চ দারিদ্র্য সীমা ব্যবহার করে দেখা যায় যে, এ সকল এলাকার দারিদ্র্যের হার জাতীয় গড়ের তুলনায় বেশি। একইভাবে উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ জেলা (র‍্যাংকিং ২ = উচ্চ ঝুঁকি) এবং দারিদ্র্যের মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক পরিলক্ষিত হয়েছে। এ সকল জেলাসমূহের মধ্যে প্রায় ৬৭ শতাংশ এলাকায় দারিদ্র্য হার জাতীয় গড়ের তুলনায় বেশি এবং ১৩ শতাংশের দারিদ্র্য হার জাতীয় গড়ের সমান। সবচেয়ে দারিদ্র্যপীড়িত ১৫ টি জেলার প্রায় ৯০ শতাংশ এলাকা প্রাকৃতিক দুর্যোগের

তীব্র এবং উচ্চ ঝুঁকিতে রয়েছে। সবচেয়ে তীব্র ঝুঁকিপূর্ণ জেলার প্রায় ৮০ শতাংশ এলাকার মাথাপিছু আয় জাতীয় গড় আয়ের চেয়ে কম। অনুরূপভাবে ঝুঁকি শ্রেণি ২ ভুক্ত জেলাসমূহে ৬৭ শতাংশ এবং ঝুঁকি শ্রেণি ৩ ভুক্ত জেলাসমূহে প্রায় ১০০ শতাংশ এলাকার মাথাপিছু আয় জাতীয় গড় আয়ের চেয়ে কম।

চ. ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ এর প্রধান বৈশিষ্ট্য

দীর্ঘমেয়াদি রূপকল্প, অভিলক্ষ্য, অভীষ্ট ও লক্ষ্য

ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ একটি দীর্ঘমেয়াদি সমন্বিত ও সামষ্টিক পরিকল্পনা, যা পানি-সম্পদ ব্যবস্থাপনা, জলবায়ু পরিবর্তন এবং পরিবেশগত চ্যালেঞ্জগুলো বিবেচনা করে বাংলাদেশের দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়নকে সহায়তার জন্য প্রণয়ন করা হয়েছে। পানি, জলবায়ু পরিবর্তন এবং পরিবেশগত বিষয়সমূহ থেকে প্রাপ্ত সুযোগ, সম্ভাব্য ঝুঁকি এবং আশংকা ইণ্যাদি সাধারণতঃ দীর্ঘমেয়াদের হয়ে থাকে। কাজেই সংশ্লিষ্ট কৌশল, নীতি ও কর্মসূচি একটি দীর্ঘমেয়াদি দৃষ্টিকোণ থেকে প্রণয়ন করা আবশ্যক। তবে, তাৎক্ষণিক এবং মধ্যবর্তীমেয়াদের চ্যালেঞ্জসমূহের প্রতি অবশ্যই এখনই বা নিকট ভবিষ্যতে দৃষ্টি দিতে হবে। সংশ্লিষ্ট স্বল্প থেকে মধ্যমেয়াদি কৌশল, নীতি এবং কর্মসূচিও দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়নে প্রভাব ফেলে। ফলস্বরূপ, দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা এ ধরণের অনিশ্চয়তার কারণে জটিল হতে পারে। প্রকৃতির বিরূপ আচরণের ফলে পানি, জলবায়ু পরিবর্তন এবং পরিবেশ ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়, যা প্রায়শই অনুমান করা সম্ভব হয় না। দীর্ঘমেয়াদি ফলাফলের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কিন্তু সুস্পষ্টভাবে অনিশ্চিত এরুপ স্বল্প থেকে মধ্যমেয়াদে নীতিমালা, কর্মসূচি এবং বিনিয়োগ প্রকল্প গ্রহণ করা ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ এর অন্যতম প্রধান কৌশলগত চ্যালেঞ্জ। এ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় একটি সুস্পষ্ট রুপকল্প এবং কতিপয় সুনির্দিষ্ট অভীষ্ট নির্ধারণ করা হয়েছে।

ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ একটি দীর্ঘমেয়াদি দৃষ্টিভঙ্গি: ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ তে প্রাথমিকভাবে একুশ শতকের শেষের দিকে বাংলাদেশ ব-দ্বীপের সম্ভাব্য পরিবর্তন সম্পর্কে একটি দীর্ঘমেয়াদি ও বিস্তারিত রূপকল্প প্রণয়নের প্রচেষ্টা নেয়া হয়েছে। ফলশ্রুতিতে, একটি সমন্বিত, বিস্তৃত ও দীর্ঘমেয়াদি ব-দ্বীপ রূপকল্প প্রণয়ন করা হয়েছে, যা নিম্নরূপ:

রূপকল্প

"নিরাপদ, জলবায়ু পরিবর্তনে অভিঘাতসহিষ্ণু সমৃদ্ধশালী ব-দ্বীপ গড়ে তোলা"

অভিলক্ষ্য

"দৃঢ়, সমন্বিত ও সময়ের সাথে পরিবর্তনশীল কার্যকরী কৌশল অবলম্বন এবং পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনায় ন্যায়সঙ্গত সুশাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে প্রাকৃতিক দুর্যোগ, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিঘাত এবং অন্যান্য ব-দ্বীপ সংক্রান্ত সমস্যা মোকাবেলা করে দীর্ঘমেয়াদে পানি ও খাদ্য নিরাপত্তা, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও পরিবেশগত স্থিতিশীলতা নিশ্চিতকরণ"।

এ দীর্ঘমেয়াদি রূপকল্প বাস্তবায়নের জন্য এটিকে নির্দিষ্ট অভীষ্ট বা লক্ষ্যে রূপান্তর করা প্রয়োজন। দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন ফলাফল হিসেবে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও দারিদ্র্য বিমোচন, পানি ও জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে সম্পর্কিত ঝুঁকি কমানো এবং তার সাথে পরিবেশগত সংরক্ষণের লক্ষ্যমাত্রা যুক্ত করে এটি সর্বোত্তমভাবে সম্পন্ন করা যায়।

অভীষ্ট: ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ তে উচ্চতর পর্যায়ের ৩টি জাতীয় অভীষ্ট এবং ব-দ্বীপ সংশ্লিষ্ট ৬টি নির্দিষ্ট অভীষ্ট নির্ধারণ করা হয়েছে। ব-দ্বীপ সংশ্লিষ্ট অভীষ্টসমূহ উচ্চতর পর্যায়ের অভীষ্ট অর্জনে অবদান রাখবে।

উচ্চ পর্যায়ের অভীষ্ট

অভীষ্ট ১: ২০৩০ সালের মধ্যে চরম দারিদ্র্য দূরীকরণ;

অভীষ্ট ২: ২০৩০ সালের মধ্যে উচ্চ-মধ্যম আয়ের দেশের মর্যাদা অর্জন; এবং

অভীষ্ট ৩: ২০৪১ সাল নাগাদ একটি সমৃদ্ধ দেশের মর্যাদা অর্জন।

ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০'র নির্দিষ্ট অভীষ্টসমূহ

অভীষ্ট ১: বন্যা ও জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত বিপর্যয় থেকে নিরাপত্তা নিশ্চিত করা;

অভীষ্ট ২: পানির নিরাপত্তা এবং পানি ব্যবহারে অধিকতর দক্ষতা বৃদ্ধি করা;

অভীষ্ট ৩: সমন্বিত ও টেকসই নদী অঞ্চল এবং মোহনা ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা;

অভীষ্ট ৪: জলাভূমি এবং বাস্তুতন্ত্র সংরক্ষণ এবং তাদের যথোপযুক্ত ব্যবহার নিশ্চিত করা;

অভীষ্ট ৫: অন্তঃ ও আন্তঃদেশীয় পানি সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য কার্যকর প্রতিষ্ঠান ও ন্যায়সঙ্গত সুশাসন গড়ে তোলা; এবং

অভীষ্ট ৬: ভূমি ও পানি সম্পদের সর্বোত্তম সমন্বিত ব্যবহার নিশ্চিত করা।

অনিশ্চয়তা ব্যবস্থাপনা এবং দীর্ঘমেয়াদি ফলাফলের সাথে স্বল্প থেকে মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনার সংযোগ স্থাপনে ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০: প্রকৃতির বিভিন্ন নিয়ামক শক্তির দীর্ঘমেয়াদি আচরণ যার দ্বারা পানি, জলবায়ু ও পরিবেশগত উৎপাদন প্রভাবিত হয়। এরূপ অন্তর্নিহিত অনিশ্চয়তার কথা চিন্তা করে দীর্ঘমেয়াদি ব-দ্বীপ রূপকল্পকে মধ্যমেয়াদি কৌশলে রূপান্তর করার জন্য একটি নমনীয় ও অভিযোজিত পদ্ধতি গ্রহণ করা অপরিহার্য। ব-দ্বীপ পরিকল্পনাতে প্রাপ্ত তথ্য উপাত্ত ব্যবহার করে বাহ্যিক ফলাফল সম্পর্কিত বিভিন্ন ধারণার অন্তর্গত স্বল্প থেকে মধ্যমেয়াদি কৌশল, নীতি ও এর বিকল্প উদ্ভাবন করা হয়েছে। পাঁচ বছর অন্তর অন্তর নতুন তথ্য প্রাপ্তি সাপেক্ষে এ পরিকল্পনার দৃশ্যকল্প ও কৌশলসমূহ হালনাগাদ করার প্রয়োজন হবে। বিনিয়োগ প্রকল্পের নির্বাচন এবং ব-দ্বীপ পরিকল্পনা প্রণয়নে অভিযোজি দৃষ্টিভঙ্গী জলবায়ু সংবেদনশীল ব্যবস্থাপনার ভিত্তিতে স্বল্প থেকে মধ্যমেয়াদি উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ও বিনিয়োগ কর্মসূচির সাথে দীর্ঘমেয়াদি টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহের সংযোগ স্থাপন করে।

ছ. ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ এর কৌশলসমূহ

কৃষি, বন, মৎস্য, শিল্প, বাণিজ্য, গৃহস্থালী, পরিবেশ, প্রতিবেশ সুরক্ষায় প্রাকৃতিক সম্পদ হিসেবে পানির গুরুত্ব অপরিসীম। জনসংখ্যা বৃদ্ধি, নগরায়ন, শিল্পায়ন এবং কৃষি উৎপাদনের জন্য দেশব্যাপী পানির চাহিদা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। অন্যদিকে, দেশের বৈচিত্র্যময় কিন্তু ঝুঁকিপূর্ণ প্রতিবেশের জন্য পানির অপরিহার্যতা, শুষ্ক মৌসুমে পানির স্বল্পতা এবং বর্ষা মৌসুমে পানির আধিক্য বাংলাদেশের পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনায় অন্যতম চ্যালেঞ্জ। অধিকন্তু, পদ্মা-ব্রহ্মপুত্র-মেঘনা অববাহিকার ৯৩ শতাংশ পানির উৎপত্তি বাংলাদেশের বাইরে হওয়ায় বঙ্গোপসাগরে নিষ্কাশন হবার পূর্বে পানি সম্পদের ব্যবস্থাপনাকে জটিল করে তুলেছে।

বাংলাদেশ প্রায়শই প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন বন্যা, নদীভাঙন, ঘূর্ণিঝড় এবং শুষ্ক মৌসুমে খরার সম্মুখীন হয়ে থাকে। একইসাথে জলাবদ্ধতা, লবণাক্ততা, আর্সেনিক দূষণ, ইত্যাদি সমস্যাও প্রকট। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে বাংলাদেশকে তার উজানের দেশগুলোর সাথে নদীগুলোর ন্যায্য পানির হিস্যা লাভে উদ্ভূত অনিশ্চয়তা মোকাবেলা করা। কাজেই, সমন্বিত এবং সামষ্টিক কৌশলগত পদ্ধতিতে এ জটিল প্রাকৃতিক সম্পদের যথাযথ ব্যবস্থাপনা বাংলাদেশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

জাতীয় উন্নয়নে পানি, জলবায়ু পরিবর্তন, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, পরিবেশ, প্রতিবেশগত ভারসাম্য, কৃষি, ভূমি ব্যবহার এবং অভ্যন্তরীণ পানি ব্যবস্থাপনার সম্ভাবনাকে কাজে লাগানো এবং দুর্যোগ মোকাবেলার জন্য বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ একটি অভিযোজনভিত্তিক, সামগ্রিক এবং দীর্ঘমেয়াদি কৌশলগত মহা-পরিকল্পনা।

পানি সম্পদের টেকসই ব্যবহার এবং পানির দ্বারা সৃষ্ট প্রাকৃতিক বিপর্যয় রোধ ব-দ্বীপ পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য। এ প্রেক্ষাপটে বর্ষা এবং শুষ্ক মৌসুমে পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত অনিশ্চয়তার কথা মাথায় রেখে উপযুক্ত কর্ম-কৌশল নিরুপণ করা হয়েছে। উন্নয়নের প্রয়োজন ও পরিস্থিতি বিবেচনায় পর্যায়ক্রমিক পর্যালোচনা ও পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সঙ্গে সংগতি রেখে অভিযোজনভিত্তিক অভিকল্পে এ কৌশলসমূহ নির্ধারণ করা হয়েছে। কার্যকারিতা এবং সর্বজনীন উপকারের ক্ষেত্রে কেবল এগুলো 'নো রিগ্রেট (No Regret)' কৌশল নয় বরং উদ্ভাবনী, আধুনিক তথ্য প্রযুক্তি এবং প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি সম্বলিত সমন্বিত বাস্তবায়ন উদ্যোগ। পানি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত চ্যালেঞ্জ যেমন দেশব্যাপী বন্যা, খরা, শুষ্ক মৌসুমে বরেন্দ্র অঞ্চলের পানি সংকট, নদী এবং মোহনা অঞ্চলের নদী ভাঙ্গন ও পলি জমা, উপকূলীয় জলোচ্ছ্বাস ও লবণাক্ততা, হাওরের আকস্মিক পাহাড়ি ঢল এবং জলাভূমি ব্যবস্থাপনা, শহরাঞ্চলের পয়ঃনিষ্কাশন এবং নিষ্কাশন, পার্বত্য চট্টগ্রামের পানি সংকট, আন্তঃ দেশীয় পানি ব্যবস্থাপনা প্রভৃতি মোকাবেলায় ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ তে জাতীয় পর্যায়ে এবং হটস্পট ভিত্তিক কতিপয় কৌশল ও কার্যক্রমের প্রস্তাব করা হয়েছে।

(১) জাতীয় পর্যায়ের কৌশল

১.১ বন্যা ঝুঁকি (Flood Risk) ব্যবস্থাপনা কৌশল

বন্যা ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কৌশল ৩টি মূলনীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত:

- পরিবেশের বিপর্যয় না করে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সহায়ক কৌশল;
- প্রাকৃতিক সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার করে জলবায়ু পরিবর্তন অভিঘাত সহিষ্ণু বাংলাদেশ গড়ে তোলা; এবং
- সকলের অংশগ্রহণে জলবায়ু পরিবর্তন অভিঘাত সহিষ্ণুতার ওপর ভিত্তি করে উন্নয়ন।

বন্যা ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কৌশল ১: অর্থনৈতিক ভিত্তি ও গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামোর সুরক্ষা প্রদান

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখে এরূপ অঞ্চলসমূহে একটি সর্বোচ্চ পর্যায়ের বন্যা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গড়ে তোলা প্রয়োজন। অর্থনীতির অগ্রযাত্রায় বিনিয়োগ আকর্ষণ বাড়ানোর জন্যও এটি জরুরি। এই পর্যায়ের সুরক্ষা প্রদান করতে পারে এমন সাধারণ কার্যক্রমগুলো হল বাঁধ নির্মাণ, ভাঙ্গন রোধ এবং কার্যকর পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা। ইতোমধ্যেই বেশিরভাগ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে, যদিও তা প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে। উপরন্তু, হাসপাতাল, বিদ্যুৎ কেন্দ্র, শিল্প-কারখানা এরূপ গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা এবং তাদের আন্তঃসংযোগ ব্যবস্থাদি বন্যা অভিযোজি হওয়া প্রয়োজন। বন্যা ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কাঠামো এমনভাবে নেয়া প্রয়োজন যাতে বাঁধ বা অন্য কোন অবকাঠামো নির্মাণের ফলে তা অন্য এলাকায় জলমগ্নতা, বন্যাসহ কোন নেতিবাচক প্রভাব না ফেলে।

বন্যা ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কৌশল ২: ভবিষ্যতের জন্য বন্যা ব্যবস্থাপনা ও পানি নিষ্কাশন স্কিমের উন্নয়ন

একটি জলবায়ু সহিষ্ণু বাংলাদেশ গড়ে তোলার জন্য বর্তমান ভৌত ও আর্থ-সামাজিক চাহিদা এবং ভবিষ্যতের উন্নয়ন উপযোগি কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ প্রয়োজন। বিগত ৬০ বছরে বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও পানি নিষ্কাশন খাতে দেশে বিপুল বিনিয়োগ হয়েছে। এ সকল বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা পুনর্বিন্যাস করা প্রয়োজন। জলবায়ু এবং পানি ব্যবস্থাপনায় পরিবর্তন, সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি এবং পরিবর্তনশীল ভূমি ব্যবহার, অবকাঠামো ও নগরায়নের কথা চিন্তা করে ভবিষ্যতের পরিকল্পনা গ্রহণ করা আবশ্যক। জলবায়ু পরিবর্তনের বিদ্যমান প্রক্ষেপণে দেখা যায় যে, ২০৩০ সাল নাগাদ দ্রুত পরিবর্তনশীল আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট এ ক্ষেত্রে আরো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। ২০৩০ সালের পরে কোন ধরণের পরিস্থিতি সত্যিকার অর্থে দৃশ্যমান হয় তার উপর জলবায়ু পরিবর্তন একটি উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলতে পারে। ভবিষ্যতে কী ঘটবে তা সহজাতভাবে অনিশ্চিত এবং পরিবর্তিত অবস্থার কারণে দ্রুত কার্যকারিতা হারায় এরূপ বিনিয়োগ পরিহার করা প্রয়োজন। একই সঙ্গে,

মাত্রাতিরিক্ত অবকাঠামো নির্মাণ করা হলে পরবর্তীতে যদি তা ব্যবহার অনুপযোগী হয় সেক্ষেত্রে সীমিত সম্পদের অপচয় হয়। তাছাড়া বন্যা ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কাঠামো নির্মাণের ক্ষেত্রে উজানের দেশের পানি প্রবাহ, নদীপথের পরিবর্তনে নদী ভাঙ্গন এবং চর জেগে ওঠার বিষয়টিও চ্যালেঞ্জ হিসাবে বিবেচনা করতে হবে। সীমার মধ্যে থেকে সময়ের সাথে পরিবর্তনশীল কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ সবচেয়ে উপযোগী। এগুলোকে 'শেষে পরিতাপ নয় (No Regret)' এরূপ পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এভাবেই ডেল্টা দৃশ্যকল্পে জলবায়ু পরিবর্তন, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন কৌশল এবং পদক্ষেপের যৌক্তিকতা নিরূপণ করা হয়। উপ-কৌশলসমূহ হচ্ছে ঃ

- **বন্যা ঝুঁকি উপ-কৌশল ২.১:** নদীতে বন্যা ও পানি প্রবাহ নিয়ন্ত্রণের কোন কার্যক্রম গ্রহণের পূর্বে 'ডুবোচর' ব্যবস্থাপনাকে গুরুত্ব প্রদান;
- **বন্যা ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা উপ-কৌশল ২.২:** FMD scheme এর অভ্যন্তরে নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন;
- **বন্যা ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা উপ-কৌশল ২.৩:** জলাধার সংরক্ষণ এবং FMD/I Schemes এর মধ্যে সংযোগ রক্ষা/পুনঃস্থাপন;
- **বন্যা ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা উপ-কৌশল ২.৪:** বাঁধ ও অন্যান্য পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনা কাঠামো সংস্কার, পুনঃনির্মাণ, প্রয়োজন অনুযায়ী নকশা সংশোধন ও পরিবর্তন; এবং
- **বন্যা ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা উপ-কৌশল ২.৫:** সম্ভাব্যতা জরিপের মাধ্যমে নদী খনন এবং ক্যাপিটাল ড্রেজিং ও সংরক্ষণ ড্রেজিং সংক্রান্ত কার্যক্রম গ্রহণ।

বন্যা ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কৌশল ৩: বিপন্ন জনগোষ্ঠীর জীবিকার সুরক্ষা

অর্থনীতির ভিত্তিসমূহের সুরক্ষার পাশাপাশি দেশের বিপন্ন অঞ্চল ও জনগোষ্ঠীর নিরাপত্তা প্রদান এবং অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখাও গুরুত্বপূর্ণ, যা রাষ্ট্রের 'কাউকে পিছনে ফেলে নয়' নীতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। বন্যার ঝুঁকি এড়ানো এবং সবার জন্য একটি বন্যামুক্ত বাংলাদেশ গড়ে তোলা এ ধরণের সুরক্ষার লক্ষ্য নয়। বর্তমান অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রেক্ষাপটে সামনের দশকগুলোতে এটি সম্ভবপর নাও হতে পারে। চরম প্রাকৃতিক ও আর্থ-সামাজিক দুরাবস্থা এবং দুর্গম ও দরিদ্র এলাকায় বন্যা সুরক্ষার কাঠামোগত কার্যক্রম ও রক্ষণাবেক্ষণের অপর্যাপ্ততা বিবেচনা করে এ ক্ষেত্রে মধ্যমেয়াদি লক্ষ্য অর্জিত নাও হতে পারে। কাউকে পিছনে ফেলে নয় এর অর্থ হচ্ছে: ১) বৃহৎ এবং চরম বন্যার সবচেয়ে ক্ষতিকর প্রভাবকে কমিয়ে আনা; এবং ২) বন্যা পরবর্তী সময়ে বন্যা দুর্গতদের দ্রুত পুনরুদ্ধারের সক্ষমতা অর্জন। উপ-কৌশলসমূহ হচ্ছে:

- **বন্যা ঝুঁকি উপ-কৌশল ৩.১:** বর্ষা মৌসুমে কিংবা বন্যার সময় নদীতে প্রবাহিত অতিরিক্ত পানি দ্রুততম সময়ে নিষ্কাশনের সুবিধা রেখে নদী ও বাঁধ ব্যবস্থাপনার কার্যক্রম গ্রহণ;
- **বন্যা ঝুঁকি উপ-কৌশল ৩.২:** নদী ব্যবস্থাপনা এবং উন্নত বন্যা ব্যবস্থাপনা পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ;
- **বন্যা ঝুঁকি উপ-কৌশল ৩.৩:** বহুমুখি ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রসমূহের সংখ্যা বাড়ানো, উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ এবং আনুষঙ্গিক সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি ও জরুরি সেবা সম্প্রসারণ;
- **বন্যা ঝুঁকি উপ-কৌশল ৩.৪:** বন্যা প্রতিরোধী পানি সরবরাহ এবং পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন;
- **বন্যা ঝুঁকি উপ-কৌশল ৩.৫:** বন্যা ও জলোচ্ছ্বাস প্রতিরোধী আবাসন ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা নির্মাণ এবং প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে প্রয়োজনীয় গুরুত্বপূর্ণ সেবা প্রদান;
- **বন্যা ঝুঁকি উপ-কৌশল ৩.৬:** সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থা এবং দুর্যোগ পরবর্তী দ্রুত পুনরুদ্ধার কার্যক্রম সম্প্রসারণ ও শক্তিশালীকরণ; এবং
- **বন্যা ঝুঁকি উপ-কৌশল ৩.৭:** নদী ব্যবস্থাপনার সাথে সাথে বন্যা, পানি নিষ্কাশন এবং রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন ও নদীর প্রবাহ নিশ্চিত করা।

১.২ স্বাদু পানি বিষয়ক (Fresh Water-FW) কৌশল

স্বাদু পানি কৌশল ১: টেকসই ও অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধির জন্য চাহিদা ও যোগানের ভারসাম্য রক্ষার

মাধ্যমে পানির প্রাপ্যতা নিশ্চিতকরণ ।

টেকসই ও অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধির জন্য চাহিদা ও যোগানের ভারসাম্য রক্ষার মাধ্যমে পানির প্রাপ্যতা নিশ্চিত করাই স্বাদু পানি সংক্রান্ত কৌশলের লক্ষ্য। আন্তঃদেশীয় পানি ব্যবস্থাপনার বিষয়টি এখানে গুরুত্বপূর্ণ। এর আওতাধীন উপ-কৌশলসমূহ হচ্ছে:

- **স্বাদু পানি উপ-কৌশল ১.১:** বেসিন ওয়াইড পদ্ধতি অনুসরণ করে দেশের বিভিন্ন স্থানে নদীর ওপর বাঁধ নির্মাণ করে দেশের অভ্যন্তরে পানি সংরক্ষণসহ সুষ্ঠু পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা;
- **স্বাদু পানি উপ-কৌশল ১.২:** প্রধান নদীগুলিতে ভূ-উপরিস্থ পানি ব্যবহারে নতুন সেচ প্রকল্প গ্রহণ;
- **স্বাদু পানি উপ-কৌশল ১.৩:** স্থানীয় পর্যায়ের বিদ্যমান জলাধার (খাল, পুকুর, বাওর) পুনঃখনন এবং সংরক্ষণের মাধ্যমে স্থানীয়ভাবে পানি সংরক্ষণ এবং বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ;
- **স্বাদু পানি উপ-কৌশল ১.৪:** সম্ভাব্যতা জরিপের মাধ্যমে রাবার বাঁধ নির্মাণের জন্য স্থান নির্বাচন;
- **স্বাদু পানি উপ-কৌশল ১.৫:** আঞ্চলিক নদ-নদীগুলোর প্রবাহ বৃদ্ধিতে পদক্ষেপ গ্রহণ;
- **স্বাদু পানি উপ-কৌশল ১.৬:** নদী ও জলাভূমি পুনরুদ্ধার এবং জীব-বৈচিত্র্য সংরক্ষণে গুরুত্ব প্রদান;
- **স্বাদু পানি উপ-কৌশল ১.৭:** ভূ-গর্ভস্থ পানি ব্যবহারে কড়াকড়ি আরোপ এবং সংরক্ষণ; এবং
- **স্বাদু পানি উপ-কৌশল ১.৮:** নগর এবং গ্রামীণ নদীতে স্বাদু পানি প্রবাহ বৃদ্ধি ও সার্বিকভাবে দূষণমুক্ত রাখা।

এ কৌশলের আওতায় একটি উল্লেখযোগ্য কর্মকান্ড হিসেবে যথাযথ সমীক্ষা সাপেক্ষে পদ্মা ব্যারেজ নির্মাণের প্রস্তাব করা হয়েছে। এ ব্যারেজ নির্মিত হলে তা শুষ্ক মৌসুমে পদ্মা নদীর পানির সর্বোচ্চ ব্যবহার সম্ভব হবে। তাতে একদিকে যেমন উপকূলীয় অঞ্চল এবং বরেন্দ্র ও খরাপ্রবণ এলাকায় সেচ কাজের জন্য প্রয়োজনীয় পানির সরবরাহ নিশ্চিত হবে, অন্যদিকে তেমনি এ অঞ্চলের নদ-নদীসমূহে স্বাদু পানির প্রবাহ বৃদ্ধি পাবে। সামগ্রিকভাবে এ অঞ্চলে কৃষি ও মৎস্য উৎপাদন বহুলাংশে বৃদ্ধি পাবে ও লবণাক্ততা হ্রাস পাবে। এছাড়া, দেশব্যাপী স্বাদু পানির সরবরাহ বৃদ্ধিকল্পে কার্যকরী পদক্ষেপ হিসেবে প্রাকৃতিক জলাধার সংরক্ষণ, পুকুর-খাল পুনঃখনন, বৃষ্টির পানি সংগ্রহ ও ধরে রাখা, শুষ্ক মৌসুমে পানির প্রাপ্যতা বৃদ্ধির জন্য নদীর সাথে খাল-বিলের সংযোগ পুনঃস্থাপন প্রভৃতির ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

স্বাদু পানি কৌশল ২: স্বাস্থ্য, জীবিকা এবং প্রতিবেশের জন্য পানির গুণাগুণ বজায় রাখা এটি স্বাদুপানি কৌশলের দ্বিতীয় উদ্দেশ্য "পানির গুণাগুণ" এর ওপর ভিত্তি করে প্রণীত। অনেকগুলো নদী ও জলাভূমি গুরুতর পরিবেশগত ঝুঁকিতে থাকায় পানির গুণমান বজায় রাখা একটি উদ্বেগের বিষয়। সুস্থ জীবন, জীবিকা এবং সুষ্ঠু প্রতিবেশ নিশ্চিত করার জন্য নীতি-নিয়মের ভিত্তিতে পানির গুণগত মান বজায় রাখা প্রয়োজন। এর আওতায় উপ-কৌশলসমূহ হচ্ছে:

- **স্বাদু পানি উপ-কৌশল ২.১:** সুষ্ঠু বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং শহুরে ও গ্রামীণ এলাকায় দূষণ হ্রাস;
- **স্বাদু পানি উপ-কৌশল ২.২:** দূষণ পরিবীক্ষণ, নিয়ন্ত্রণ এবং নিয়ন্ত্রিত মাত্রায় দূষণের অনুমতি প্রদান; এবং
- **স্বাদু পানি উপ-কৌশল ২.৩:** উন্নত বাস্তুসংস্থান সেবার (Ecosystem Services) জন্য প্রায়োগিক গবেষণা।

(২) হটস্পট নির্দিষ্ট কৌশলসমূহ

২.১ উপকূলীয় অঞ্চল

উপকূলীয় বন্যার জন্য বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চল সুদূর ভবিষ্যতেও বিপজ্জনক অবস্থায় থাকবে। বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট ঘূর্ণিঝড় এবং তার সাথে জলোচ্ছ্বাস যেমন অব্যাহত থাকবে, তেমনি নদীসমূহের উচ্চ প্রবাহ এবং অতি মাত্রায় মৌসুমী বৃষ্টিপাত ক্রমাগত উপকূলীয় ব-দ্বীপে পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থার উপর বিশাল চাপ সৃষ্টি করবে। পাশাপাশি, নদী প্রবাহের পরিবর্তন অথবা সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি ভবিষ্যতে উপকূলীয় অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক অবস্থার ওপর ব্যাপক চাপ সৃষ্টি করবে। এ ক্ষেত্রে

অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং জনতাত্ত্বিক পরিবর্তনও প্রধান চালকের ভূমিকায় থাকবে। এ হটস্পট নির্দিষ্ট কৌশলসমূহ হচ্ছে:

- **বিদ্যমান পোল্ডারের কার্যকর ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ঝড়বৃষ্টি/জলোচ্ছ্বাস এবং লবণাক্ততার অনুপ্রবেশের মোকাবেলা;**
- **পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থার সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং বন্যার ঝুঁকি হ্রাস;**
- **টেকসই প্রবৃদ্ধির জন্য পানির যোগান এবং চাহিদার ভারসাম্য বজায় রাখা;**
- **স্বাদু পানি সরবরাহ বৃদ্ধিকল্পে মৃতপ্রায় নদীসমূহের পুনরুদ্ধার এবং আন্তঃদেশীয় নদীসমূহের অববাহিকা ব্যবস্থাপনা;**
- **উপকূলীয় অঞ্চলে নতুন জমি পুনরুদ্ধার; এবং**
- **সুন্দরবন সংরক্ষণ।**

নদীর জোয়ার-ভাটার ব্যবস্থাপনা (Tidal River Management-TRM)

জলাবদ্ধতা নিরসন, নদীর নাব্যতা বৃদ্ধি ও ভূমি পুনরুদ্ধারে নদীর জোয়ার-ভাটার ব্যবস্থাপনা একটি কার্যকরি কর্মকৌশল। বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ তে উপকূলীয় অঞ্চলের এ সকল সমস্যা সমাধানে নদীর জোয়ার-ভাটার ব্যবস্থাপনায় অধিকতর দক্ষতা আনয়ন ও তা অন্তত: ৭টি বিলে সম্প্রসারণের সুপারিশ করা হয়েছে।

২.২ বরেন্দ্র এবং খরাপ্রবণ অঞ্চল

খরা অথবা স্বাদু পানির প্রাপ্যতার নিরিখে সমগ্র দেশের প্রতিনিধিত্বকারী অঞ্চল হিসেবে বরেন্দ্র ও খরাপ্রবণ হটস্পটকে নির্বাচিত করা হয়েছে। ব-দ্বীপ পরিকল্পনার লক্ষ্য অর্জনে সহায়তা এবং বরেন্দ্র ও খরাপ্রবণ হটস্পট অর্ন্তগত এলাকার চলমান উন্নয়ন কাজ আরো বেগবান করতে নিম্নলিখিত কৌশলসমূহ অবলম্বন করা প্রয়োজন:

- **টেকসই ও অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধির জন্য চাহিদা ও যোগানের ভারসাম্য রক্ষা;**
- River basin **উন্নয়নসহ কার্যকর আন্তঃদেশীয় পানি ব্যবস্থাপনা;**
- **বন্যা ও জলাবদ্ধতাজনিত ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস;**
- **পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন নিশ্চিত করা; এবং**
- **বৃষ্টির পানি সংরক্ষণে পুকুর/দিঘী ও পাতকূয়া খনন উৎসাহিতকরণ।**

২.৩ হাওর এবং আকস্মিক বন্যাপ্রবণ অঞ্চল

হাওর অববাহিকা দেশের খাদ্য নিরাপত্তাহীন অঞ্চলগুলোর মধ্যে একটি। এ এলাকার বাসিন্দাদের উন্নয়নের জন্য যেমন সুযোগ রয়েছে তেমনি সীমাবদ্ধতাও রয়েছে। দীর্ঘমেয়াদি বন্যার কারণে বছরে শুধুমাত্র একটি ফসল (ধান) উৎপাদন সম্ভব হয়, যা এ অঞ্চলের খাদ্য নিরাপত্তাবিহীনতার মূল কারণ। এ হটস্পট সংশ্লিষ্ট কৌশলসমূহ হচ্ছে:

- **বন্যা থেকে কৃষি ও বিপন্ন জনগোষ্ঠীসমূহকে রক্ষা;**
- **সুপেয় পানির নিরাপত্তা নিশ্চিত করা;**
- **পানিসম্পদ ও নদী ব্যবস্থাপনা;**
- **টেকসই হাওর প্রতিবেশ এবং জীববৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনা;**
- **সমন্বিত পানি এবং ভূমিসম্পদ ব্যবস্থাপনা; এবং**
- **হাওরগুলোকে আপন বৈশিষ্ট্যে সংরক্ষণ ও সংস্কার।**

২.৪ পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল

'পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল' হটস্পটে পাহাড় এবং সংলগ্ন উপকূলীয় সমভূমি উভয়কে বিবেচনা করা হয়েছে। কারণ পাহাড়ী অঞ্চলে ভূমিধ্বসের সাথে উপকূলীয় সমতল অঞ্চলের কতিপয় সমস্যা যেমন অধঃক্ষেপন (Sedimentation) এবং পুনরাবৃত্ত নদী খনন (Recurrent Dredging) জড়িত। এ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে বাংলাদেশের বড় বড় নদীগুলোর অববাহিকা দেশের বাইরে অবস্থিত কিন্তু পূর্বাঞ্চলীয় পার্বত্য এলাকার গুরুত্বপূর্ণ নদীগুলোর বেশিরভাগ অববাহিকা দেশের সীমানার মধ্যেই রয়েছে, যাতে সমন্বিত নদী অববাহিকা ব্যবস্থাপনা এবং সার্বিকভাবে সমস্যা মোকাবেলার চমৎকার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এ হটস্পটের কৌশলসমূহ হচ্ছে:

- **বন্যা ও ঝড়বৃষ্টি থেকে অর্থনৈতিক অঞ্চল ও শহর রক্ষা;**
- **পানি নিরাপত্তা এবং টেকসই পয়ঃনিষ্কাশন নিশ্চিত করা;**
- **সমন্বিত নদী ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা;**
- **পরিবেশগত ভারসাম্য এবং মূল্যমান বজায় রাখা; এবং**
- **টেকসই প্রবৃদ্ধির জন্য বহুমুখি সম্পদ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির বিকাশ।**

২.৫ নদী অঞ্চল এবং মোহনা

দেশের প্রধান নদ-নদীগুলো বাংলাদেশ ব-দ্বীপ গঠনে মূল ভূমিকা পালন করেছে। তাই ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ -তে নদী ব্যবস্থাপনার ওপর যথেষ্ট গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। নদীগুলোর জন্য একটি দীর্ঘমেয়াদি কৌশল প্রণয়ন জাতীয়ভাবে গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশে পানি ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন চ্যালেঞ্জগুলো গতিশীল এবং শক্তিমান নদী থেকে উদ্ভূত হয়েছে। তাই নদী অঞ্চল এবং মোহনা সংশ্লিষ্টকৌশলসমূহ হচ্ছে:

- **বন্যার ঝুঁকি কমাতে নদী ও পানি প্রবাহের জন্য পর্যাপ্ত সুযোগ রাখা;**
- **পানি প্রবাহের সক্ষমতা বৃদ্ধির পাশাপাশি নদীগুলোকে স্থিতিশীল রাখা;**
- **পর্যাপ্ত পরিমাণে ও মানসম্মত স্বাদু পানি সরবরাহ করা;**
- **নদীগুলোর পরিবেশগত ভারসাম্য বজায় রাখা;**
- **নদীগুলোতে নিরাপদ এবং নির্ভরযোগ্য নৌ-পরিবহন ব্যবস্থা গড়ে তোলা;**
- **নতুনভাবে জেগে ওঠা চর এলাকায় নদী ও মোহনা ব্যবস্থাপনা জোরদারকরণ;**
- **নতুনজেগে ওঠা জমি/চরে কৃষি কাজ, শিল্প পার্ক গড়ে তোলা;**
- **বালুমহালের স্থান নির্দিষ্ট সময় অন্তর প্রয়োজনবোধে পরিবর্তনের জন্য স্থানীয় প্রশাসনকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে। বালুমহাল এবং পলি/ড্রেজিং থেকে প্রাপ্ত মাটি/বালি ব্যবস্থাপনা বিষয়েও সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন; এবং**
- **সুদৃঢ় ক্যাপিটাল ড্রেজিং এবং রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচিসহ যথাযথ পলি (sediment) ব্যবস্থাপনা।**

২.৬ নগর অঞ্চল

গ্রাম থেকে শহরমুখী অভিবাসনের কারণে দেশের বর্তমান নগর কেন্দ্রগুলোর উন্নয়নের ধারাবাহিকতা আগামী দশকেও অব্যাহত থাকবে এবং ২০৪৫ সালের মধ্যে জনসংখ্যার অধিকাংশই শহরে বাস করবে। যদিও এই কৌশলটি নগর অঞ্চলের পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পর্কিত, তবুও এ অঞ্চলের যে সকল বিষয় বর্তমান এবং ভবিষ্যতে সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হবে সেগুলোও বিবেচনা করা গুরুত্বপূর্ণ। সাধারণভাবে নগর পরিকল্পনা সংক্রান্ত বিষয়গুলো, যেমন অনিয়ন্ত্রিত নগরায়ন এবং অপরিকল্পিত উন্নয়ন ইত্যাদির সাথে পানি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিষয় যেমন বন্যার ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। কিছু অন্তর্নিহিত বিষয় যেমন জনসংখ্যার অধিক ঘনত্ব এবং বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক উপাদান বর্তমানে নাগরিক সেবার জন্য চ্যালেঞ্জ হিসেবে কাজ করে।

এক্ষেত্রে পানি ব্যবস্থাপনা এবং সাধারণভাবে নগরের অন্যান্য সমস্যার সমাধানে প্রভাব সৃষ্টিকারী এবং

কার্যকর কৌশলসমূহ বিবেচনা করা হয়েছে। কৌশলসমূহ হচ্ছে:

- **পানি নিষ্কাশন সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং নগর এলাকায় বন্যার ঝুঁকি হ্রাসকরণ ;**
- **নগর অঞ্চলে পানি নিরাপত্তা এবং পানি ব্যবহারের দক্ষতা বৃদ্ধি;**
- **নতুনভাবে জেগে ওঠা এলাকায় নদী ও মোহনা ব্যবস্থাপনা জোরদারকরণ;**
- **শিল্প কারখানাসহ অন্যান্য উৎসের মাধ্যমে নদ-নদী ও অন্যান্য জলাশয়ের দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও পরিবীক্ষণ;**
- **নগর জলাভূমিসহ প্রতিবেশ সংরক্ষণ ও অক্ষুন্ন রাখা এবং তাদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ;**
- **নগরে কার্যকর প্রতিষ্ঠান এবং সুশাসন গড়ে তোলা;**
- **নগরাঞ্চলে ভূমি ও পানি সম্পদের সমন্বিত এবং টেকসই ব্যবহার; এবং**
- **নাগরিক সেবা যেমন- পানি সরবরাহ, পয়ঃনিষ্কাশন, তরল, কঠিন এবং মেডিকেল ও ইলেকট্রনিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ইত্যাদির উন্নয়ন।**

(৩) পরস্পর সম্পর্কযুক্ত বিষয়ের কৌশল

৩.১ টেকসই ভূমি ব্যবহার এবং স্থানিক পরিকল্পনা

ভূ-সম্পত্তির জন্য পরিকল্পনা, ব্যবস্থাপনা ও কৌশল প্রণয়ন ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ এর অবিচ্ছেদ্য অংশ। কৃষি, বন, নদীনালা, খাল, বিল প্রভৃতি প্রাকৃতিক অঞ্চলসহ নগর ও শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় জমি সবই ভূমি ব্যবহার কৌশলের অন্তর্ভুক্ত। ভূমি ব্যবস্থাপনায় কৃষি ও অকৃষি উভয় খাতে ব্যবহৃত জমিকে বিবেচনা করা হয়েছে বিধায় ভূমি ব্যবহার ব্যবস্থাপনায় স্থানিক পরিকল্পনার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এর আওতাধীন কৌশলসমূহ হচ্ছে:

- **বালুমহাল এবং পলি/ড্রেজিং থেকে প্রাপ্ত মাটি/বালি ব্যবস্থাপনা বিষয়েও সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন;**
- **টেকসই খাদ্যশস্য উৎপাদনে বন্যা বা নদীর ভাঙ্গন থেকে কৃষি জমির সংরক্ষণ;**
- **লবণাক্ততার অনুপ্রবেশ এবং মরুকরণ প্রতিরোধ;**
- **মেঘনা মোহনায় নতুন জেগে ওঠা ভূমির ব্যবস্থাপনা;**
- **কৃষি ও অকৃষি জমি বৃদ্ধির জন্য টেকসই উপকূলীয় ভূমি ব্যবস্থাপনা;**
- **ডিজিটাল ভূমি সম্পদ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির উন্নয়ন; ও সম্পর্কিত আইন/বিধিগুলো হালনাগাদকরণ;**
- **ল্যান্ড জোনিং এর জন্য প্রয়োজনীয় আইন ও বিধি প্রণয়ন;**
- **ভূমি ব্যবস্থাপনার জন্য জলবায়ু পরিবর্তনে অভিযোজন সক্ষমতা বৃদ্ধি;**
- **নগরায়নের জন্য স্থানীয় ভূমি ব্যবহারের পরিকল্পনা;**
- **ভূমি ব্যবহারে সর্বোচ্চ দক্ষতা অর্জন;**
- **স্থানিক পরিকল্পনা এবং ভূমিসম্পদ ব্যবস্থাপনা আইন প্রণয়ন;**
- **ভূমি স্থিতিশীল করার জন্য উপকূলীয় অঞ্চলে বনায়ন বৃদ্ধি;**
- **মাটির গুনাগুণ বজায় রাখা এবং ভূমির ক্ষয়-ক্ষতি রোধ; এবং**
- **ভূমি রক্ষায় উপকূলীয় পানিসম্পদ অবকাঠামোগুলোর সমন্বিত ব্যবস্থাপনা।**

৩.২ কৃষি, খাদ্য নিরাপত্তা, পুষ্টি এবং জীবিকা

জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে প্রধানত কৃষি খাতের উৎপাদন হ্রাস পাবে। ২১০০ সালের মধ্যে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বাংলাদেশের অর্থনীতি যে ক্ষয়-ক্ষতির সম্মুখীন হবে তা বৈশ্বিক গড় ক্ষতির তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি হতে পারে। কৃষি, খাদ্য নিরাপত্তা, পুষ্টি এবং জীবিকার কৌশলসমূহ হচ্ছে:

- কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থার ঘাত সহিষ্ণুতা (Resilience) বৃদ্ধি;
- কৃষি উৎপাদন এবং জীবিকার মধ্যে বৈচিত্র্য আনয়ন;
- কৃষি জমি থেকে গ্রীন হাউস গ্যাস নিঃসরণ (Emission) কমানো;
- বৃহদায়তন বাণিজ্যিক খামার স্থাপনে উৎসাহ প্রদান;
- মাছ ও উদ্ভিদের সমন্বিত চাষে জলোপযোগি (Aquaponics) পদ্ধতির প্রবর্তন;
- কৃষিজাত পণ্যের প্রক্রিয়াকরণ, বন্টন এবং প্যাকেজিং এ ন্যানোটেকনোলজি ব্যবহার করা;
- নির্ভুল (Precision) কৃষি মডেল চালু ;
- জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব কমানের জন্য উন্নত খামার এবং প্রযুক্তি ব্যবহার;
- উদ্ভিদ, বন্য প্রাণি, মৎস্য ও পরিযায়ী পাখির জন্য বাস্তুতন্ত্র সংরক্ষণ ও ফলদ বৃক্ষরোপন উৎসাহিতকরণ;
- শুধু ধান নয়, মৎস্য চাষের জন্য হাওর অঞ্চলে জলাভূমি ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন;
- দীর্ঘমেয়াদে মাছের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করার জন্য জীব বৈচিত্র্য বজায় রাখা;
- সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদের টেকসই ব্যবস্থাপনা; এবং
- জলবায়ু সহিষ্ণু পশু পাখির জাত উদ্ভাবন ও পালন।

৩.৩ আন্তঃদেশীয় পানি ব্যবস্থাপনা

পদ্মা-ব্রহ্মপুত্র-মেঘনা অববাহিকার সঙ্গমস্থল হওয়ায় এবং পার্শ্ববর্তী দেশসমূহ থেকে অন্তঃ ও আন্তঃদেশীয় প্রবাহ থাকায় ভারত, নেপাল, ভুটান, মিয়ানমার ও চীনের সাথে পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত সহযোগিতা বাংলাদেশের উন্নয়নের জন্য অপরিহার্য। এ ক্ষেত্রে পৃথকভাবে প্রচেষ্টার চেয়ে যৌথ সহযোগিতার মাধ্যমে প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তোলা গুরুত্বপূর্ণ। এ সংক্রান্ত কৌশলসমূহ হচ্ছে:

- উজানের নদীসমূহ হতে পানি সরিয়ে নেয়ার বিষয়টিকে বিবেচনায় রেখে সে অনুযায়ী কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ;
- উজানের পানি প্রবাহের বাস্তব অবস্থা বিবেচনায় রেখে সংশ্লিষ্ট দেশের সাথে সমঝোতার ভিত্তিতে উপযুক্ত স্থান নির্বাচন পূর্বক পানি সংরক্ষণের প্রয়োজনে দেশের অভ্যন্তরে সম্ভাব্য বাঁধ বা ব্যারেজ নির্মাণের বিষয় বিবেচনা;
- পানিসংক্রান্ত কূটনীতির মাধ্যমে শান্তিপূর্ণভাবে সমস্যা সমাধান এবং সংঘাত প্রতিরোধ;
- তিস্তাসহ অন্যান্য সকল আন্তঃদেশীয় নদীর পানি বন্টন সংক্রান্ত চুক্তি সম্পাদন তৎপরতা অব্যাহত রাখা
- চাহিদাভিত্তিক যৌথ নদী অববাহিকা ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা গ্রহণ;
- পানিসংক্রান্ত সমস্যা সমাধানে প্রয়োজনে তৃতীয় পক্ষকে (বহুপক্ষীয় বা দ্বিপক্ষীয় উন্নয়ন সহযোগি সংস্থা বা দেশ) সম্পৃক্তকরণ; এবং
- অববাহিকা ভিত্তিক বন্যা পূর্বাভাস পদ্ধতির উন্নয়ন।

৩.৪ গতিশীল অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন ব্যবস্থা

বাংলাদেশের মোট এলাকার প্রায় ৭ ভাগ জুড়ে আছে নদ-নদী, খাল-বিল যা গড়ে তুলেছে প্রায় ২৪ হাজার কিলোমিটারের একটি নেটওয়ার্ক। নদীমাতৃক দেশ হওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই এ দেশে অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন সুবিধা অনেক বেশি। অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন ব্যবস্থা গতিশীল করার জন্য প্রস্তাবিত কৌশলসমূহ হচ্ছে:

- **উজানের নদীসমূহ হতে পানি সরিয়ে নেয়ার বিষয়টিকে বিবেচনায় রেখে সে অনুযায়ী কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে;**
- **নিয়মিত নদী খননের মাধমে নদীর প্রবহমানতা এবং নৌ চলাচল ব্যবস্থা চালু রাখা;**
- **দীর্ঘমেয়াদি টেকসই অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহনের (আইডব্লিউটি) জন্য নির্ভরযোগ্য ব্যবস্থাপনা গড়ে তোল;**
- **বিআইডব্লিউটিএ ও বাপাউবো এর সহযোগিতা ও সমন্বয়ের মাধ্যমে নৌ-পরিবহন উপযোগী পানির নূন্যতম স্তর নিশ্চিত করা;**
- **অভ্যন্তরীণ নদী বন্দর, ফেরি ঘাট, অবতরণ কেন্দ্র এবং টার্মিনাল সুবিধা উন্নয়ন, রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনা করা;**
- **পারস্পরিক সমঝোতা ও সহযোগিতার, মাধ্যমে আন্তদেশীয় পানি সংক্রান্ত সমস্যা সমাধান;**
- **নদী ও সমুদ্র বন্দরসমূহের উন্নয়ন সাধন এবং**
- **আন্ত- দেশীয় নদী পথগুলি কার্যকর করতে উদ্যোগ গ্রহণ।**

৩.৫ সুনীল অর্থনীতি (Blue Economy)

২০১৪ সালে প্রতিবেশী দেশ মিয়ানমার এবং ভারতের সঙ্গে সমুদ্রসীমা বিরোধ নিষ্পত্তির ফলে বাংলাদেশ সরকার সুনীল অর্থনীতির বিপুল সম্ভাবনাকে কাজে লাগানোর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। সুনীল অর্থনীতি এখন বাংলাদেশের অর্থনীতিতে উন্নয়নের একটি নতুন মাত্রা যোগ করেছে। এক্ষেত্রে নৌ-পরিবহন, উপকূলে জাহাজ চলাচল, সমুদ্র বন্দর, জাহাজ নির্মাণ ও পুনর্ব্যবহার, সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ, লবণাক্ততা, উপকূলীয় পর্যটন, জোয়ার ভাটা হতে শক্তি উৎপাদন, ভূমি পুনরুদ্ধার, সামুদ্রিক সম্পদ জরীপ ও নজরদারি, মানবসম্পদ উন্নয়ন ও গভর্ন্যান্সকে অগ্রাধিকারমূলক খাত হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এ সকল অগ্রাধিকার খাতে সম্পদের যথাযথ ব্যবহারের বেশ কয়েকটি পন্থা প্রস্তাব করা হয়েছে। আঞ্চলিক অংশীদারিত্বের ক্ষেত্রেও সুনীল অর্থনীতি বিকাশের বিষয়টি সর্বোচ্চ প্রাধান্য পেয়েছে। তাছাড়া, ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের এ সংক্রান্ত বিভিন্ন সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে।

সুনীল অর্থনীতির জন্য প্রস্তাবিত কৌশলসমূহ হচ্ছে:

- **সামুদ্রিক সম্পদের বহুমাত্রিক জরিপ দ্রুত সম্পন্ন করা;**
- **উপকূলীয় জাহাজের সংখ্যা বৃদ্ধি ও সমুদ্র বন্দরসমূহের আধুনিকীকরণ এবং সক্ষমতা বৃদ্ধি;**
- **অগভীর ও গভীর উভয় সমুদ্রে মাছ ধরার কার্যক্রম জোরদারকরণ;**
- **সমুদ্রে ইকটোরিজম এবং ব্যক্তিখাতে নৌবিহার কার্যক্রম চালুকরণ; এবং**
- **সমুদ্র উপকূল ও সমুদ্র বন্দরগুলোকে দূষণমুক্ত রাখা।**

৩.৬ নবায়নযোগ্য শক্তি

নবায়নযোগ্য শক্তি যেমন-সৌর শক্তি, বায়ু শক্তি, জৈব শক্তি এবং জলবিদ্যুৎ ইত্যাদির উন্নয়নে বাংলাদেশের বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে। এক্ষেত্রে কৌশলসমূহ হচ্ছেঃ

- সরকারি এবং বেসরকারি খাতের বিনিয়োগের মাধ্যমে দেশে নবায়নযোগ্য শক্তি সম্পদের সম্ভাবনা কাজে লাগানোর জন্য দীর্ঘমেয়াদি জ্বালানি নীতির পাশাপাশি অন্তত: ৫০ বছরের জন্য একটি মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন;
- নবায়নযোগ্য শক্তির ক্ষেত্রে প্রযুক্তির উন্নয়নে বিশ্ববিদ্যালয় এবং গবেষণা প্রতিষ্ঠান সমূহকে গবেষণার কাজে উৎসাহিত করা এবং তার প্রয়োগের জন্য সক্ষমতা বৃদ্ধি;
- ক্লিন ডেভেলপমেন্ট মেকানিজম (সিডিএম)সহ নবায়নযোগ্য প্রযুক্তির গবেষণা ও উন্নয়নের মাধ্যমে সবুজ প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করা;
- গ্রিড ও অফ-গ্রিড নবায়নযোগ্য শক্তি সংশ্লিষ্ট প্রকল্পগুলোর সামর্থ্যের কথা চিন্তা করে অনুদান এবং কম সুদে ঋণ প্রদানের জন্য উদ্ভাবনী অর্থায়ন প্যাকেজ প্রবর্তন; এবং

- ২০৪১ সালে উন্নত দেশ হওয়ার প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের মোট শক্তির শতকরা ৩০ ভাগ নবায়নযোগ্য উৎস হতে সরবরাহের উদ্যোগ গ্রহণের প্রস্তাব করা হয়েছে (৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ২০২০ সালের মধ্যে ১০ শতাংশে উন্নীত করার কথা বলা হয়েছে)।

৩.৭ ভূমিকম্প

বাংলাদেশ ও ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যসমূহ দীর্ঘ দিন ধরে পৃথিবীর ভূমিকম্প প্রবণ অঞ্চল হিসেবে সক্রিয় রয়েছে এবং গত ২০০ বছরে অনেক বড় বড় ভূমিকম্পের সম্মুখীন হয়েছে। ভূমিকম্প মোকাবেলায় কৌশলসমূহ হচ্ছে:

- **ভূমিকম্প ব্যবস্থাপনা শক্তিশালীকরণ এবং ভূমিকম্প মোকাবেলার সক্ষমতা বাড়ানো;**
- **বাংলাদেশ জাতীয় বিল্ডিং কোড বা অন্য অনুমোদিত মানের সাথে সামঞ্জস্য রেখে বাঁধ, নিয়ন্ত্রক, সুইচ গেট, ক্রস-বাঁধ, সড়ক, সেতু, ভবন ইত্যাদি অবকাঠামোর ভূমিকম্প রোধক নকশা তৈরী;**
- **পৌর এলাকায় ভবন নির্মাণের জন্য যথাযথ ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা প্রণয়ন; এবং**
- **স্তরচ্যুতি (Fault) এবং ভূ-পৃষ্ঠ বরাবর ভূ-গর্ভে ভূমিকম্পের উৎস (Epicenter) সনাক্তকরণে বিস্তারিত গবেষণা করা।**

(জ) সামষ্টিক অর্থনৈতিক দৃশ্যকল্প

সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামো পরিবেশ বা জলবায়ু পরিবর্তনের মাপকাঠির সাথে বাস্তব দিক (যেমন অর্থনৈতিক চলক) সংযোগের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনের অর্থনৈতিক অভিঘাত পরিমাপের বিষয়টি ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ তে প্রথম বারের মত বিবেচনা করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে নীতি দৃশ্যকল্প **(Policy Scenario)** তৈরীতে নিম্নবর্ণিত চলকসমূহ বিবেচনা করা হয়েছে:

১) তিনটি অভ্যন্তরীণ চলক: অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, কর্মসংস্থান এবং দারিদ্র্য;

২) দু'টি বাহ্যিক চলক: প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং জলবায়ু পরিবর্তন;

৩) বিপুল সংখ্যক নীতি চলক যার মধ্যে রয়েছে: জনসংখ্যা ও শ্রমশক্তি, বিনিয়োগ (সরকারী খাত, ব্যক্তিখাত এবং উভয়ের সমষ্টি)। জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত বিভিন্ন ঝুঁকি মোকাবেলায় প্রয়োজনীয় বিনিয়োগসহ খাতভিত্তিক বিনিয়োগ, সামষ্টিক অর্থনৈতিক নীতি, আন্তঃসীমান্ত পানি সংলাপ এবং প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার ও গভর্ন্যান্স প্রভৃতি।

দৃশ্যকল্পগুলো মিথষক্রিয়ার বৈশিষ্ট্যমন্ডিত (Interactive)। কারণ এগুলো বাহ্যিক ও নীতি চলকের সাথে অভ্যন্তরীণ চলকের পারস্পরিক ক্রিয়ার সুযোগ সৃষ্টি করে। ফলস্বরূপ, এই মডেল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নীতি সংক্রান্ত প্রশ্নের (ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ গ্রহণ না হলে কি পরিস্থিতি হবে) উত্তর প্রদানে সহায়তা করে।

ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ এর ভূমিকা এবং বাংলাদেশের দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়নে এর অবদানকে ব্যাখ্যা করার জন্য নির্বাচিত নীতি বিকল্পগুলোর উপর ভিত্তি করে নিম্নবর্ণিত দুটি পরিস্থিতি/দৃশ্যকল্প বিবেচনা করা হয়েছেঃ

- প্রথম বিকল্পটি হল স্থিতাবস্থা নীতি (BAU)। এটি মূলত: সরকারের রূপকল্প ২০২১, প্রেক্ষিত পরিকল্পনা এবং সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকে প্রতিনিধিত্ব করে। এতে জলবায়ু পরিবর্তন এবং প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের বিরূপ প্রভাব প্রবৃদ্ধি, কর্মসংস্থান এবং দারিদ্র্যের ফলাফলে কি পরিবর্তন ঘটাবে, তা প্রতিফলিত হয়েছে। মূলত: এ দৃশ্যকল্পে ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ ব্যতীত বিদ্যমান সকল নীতিকে বিবেচনা করা হয়েছে। ব-দ্বীপ ঝুঁকি ও বিপর্যয় ব্যবস্থাপনার একটি সমন্বিত প্রচেষ্টা ব্যতীত এটিই বর্তমান সময়ে অনুসৃত স্থিতাবস্থা নীতি।

- দ্বিতীয় বিকল্প হলো ব-দ্বীপ পরিকল্পনা নীতি, যা স্থিতাবস্থা নীতি এবং ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ সমন্বয়ে গঠিত। এই কল্পদৃশ্যে আবহাওয়া সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রাকৃতিক বিপর্যয় এবং ঝুঁকির মধ্যে

উচ্চতর ও টেকসই প্রবৃদ্ধির অর্জনের জন্য জলবায়ু পরিবর্তন এবং ব-দ্বীপ সম্পর্কিত অন্যান্য অভিযোজন ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

স্থিতাবস্থা নীতির অধীনে জলবায়ু পরিবর্তন এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের বিরূপ প্রভাব আরো বৃদ্ধি পেলে সময়ের সাথে জিডিপি প্রবৃদ্ধি হ্রাস পায়। মূলধন এর কার্যকারিতা নিম্নমুখি হয়। ঝুঁকিপূর্ণ জেলার মানুষ শহরে পাড়ি জমানোর ফলে নগরায়নের ওপর চাপ বৃদ্ধি পায়। কৃষি উৎপাদন হ্রাস পায়। ভূমির ক্ষয় এবং নিম্ন উৎপাদনশীলতা ভূমি প্রাপ্যতা কমায় এবং এতে জমির মূল্য বৃদ্ধি পায়। জনসাধারণের ক্রমশঃ নগরমুখি হওয়ার ফলে শহরে জমির ওপর অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি করে এবং জমির প্রাপ্যতা কমে যায়। বন্যা এবং পয়ঃনিষ্কাশন সমস্যা নগরে সম্পত্তি ও ব্যবসা এবং অবকাঠামোর ক্ষতি সাধন করে। ফলে উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি পায়। নগরে পানির স্বল্পতা ও গুণগণমান হ্রাস এবং পয়ঃনিষ্কাশন ঝুঁকির ফলে স্বাস্থ্যখাতে ব্যয় বেড়ে জীবনযাত্রার অবনমন ঘটে। ফলশ্রুতিতে, ২০৪১ সাল পর্যন্ত বার্ষিক গড় জিডিপি প্রবৃদ্ধি ৯ শতাংশ অর্জন ও বজায় রাখার লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ২০১৭-৪১ সময়কালের মধ্যে মোট বার্ষিক গড় জিডিপি ১.১ শতাংশ হারে হ্রাস পাবে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে, এই দৃশ্যকল্পে বাংলাদেশ ২০৩০ সালের মধ্যে উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশে পৌঁছতে এবং চরম দারিদ্র্য দূর করতে সক্ষম হবে না।

স্থিতাবস্থা নীতির বিপরীতে ব-দ্বীপ পরিকল্পনা নীতি গ্রহণ করা হলে জলবায়ু পরিবর্তন ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের নেতিবাচক প্রভাব যথেষ্ট হ্রাস পাবে। স্থিতাবস্থা নীতির অধীনে গড় জিডিপি প্রবৃদ্ধি ৬.৯ শতাংশ -এর তুলনায় ৮ শতাংশ অর্জন এবং তা ধরে রাখার মাধ্যমে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির প্রচেষ্টাকে সামনের দিকে এগিয়ে নিতে এটি সহায়তা করবে। ফলে কৃষি খাতে আয় হ্রাস এবং গ্রামীণ জীবনযাত্রার ক্ষয়ক্ষতি পরিহারসহ উচ্চ জিডিপি প্রবৃদ্ধির ওপর ভিত্তি করে ২০৩০ সালের মধ্যে চরম দারিদ্র্য দূর করা এবং উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশের মর্যাদা লাভের মাধ্যমে বাংলাদেশের উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ অর্জিত হবে।

স্থিতাবস্থা নীতির অধীনে পরিবেশগত ঝুঁকির ফলে পরবর্তী বছরগুলোতে আর্থিক ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ভিত্তি বছরের তুলনায় উলেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পাবে। জিডিপি প্রবৃদ্ধি নিম্নমুখি হয়ে ২০১৭ অর্থবছরের প্রায় ৭.২ শতাংশ থেকে ২০৪১ অর্থবছরে এমনকি ৫.৬ শতাংশে নেমে যেতে পারে। মূলধন মজুত এবং জলবায়ু সংবেদনশীল খাতসমূহের সম্ভাব্য উৎপাদন হ্রাস পাওয়ার কারণে মাথাপিছু আয় ২০৪১ অর্থবছরে মাত্র ১০,৫৪০ ইউএস ডলারে পৌঁছাবে, যা ব-দ্বীপ দৃশ্যকল্পের ১৪,৩৭৭ ইউএস ডলারের চেয়ে ৩,৮৩৭ ইউএস ডলার কম। গড়ে ৯ শতাংশ জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার অর্জনের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে এ দৃশ্যকল্পে প্রতি বছর গড়ে প্রকৃত জিডিপি'র ১.৩ শতাংশ হ্রাস পাবে। এতে ক্রমপুঞ্জিত ক্ষতির পরিমাণ ২০৪১ সালে গিয়ে দাঁড়াবে ৭৪১ বিলিয়ন ইউএস ডলারে। এ নিম্নমুখি জিডিপি প্রবৃদ্ধি কর্মসংস্থান চাহিদা এবং দারিদ্র্য বিমোচনে নেতিবাচক ভূমিকা রাখবে। এখানে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে, স্থিতাবস্থা নীতির দৃশ্যকল্পে বাংলাদেশের উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশের মর্যাদা এবং দারিদ্র্য নিরসনের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন উভয়ই ব্যর্থ হতে পারে। তবে তা ব-দ্বীপ পরিকল্পনা নীতির মাধ্যমে অর্জন করা সম্ভব। তাই ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ গ্রহণ করার যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে।

ঝ. ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ এর বিনিয়োগ ব্যয় এবং অর্থায়ন

(১) বিনিয়োগের প্রয়োজনীয়তা

ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ বাস্তবায়ন করা না হলে সামষ্টিক এবং খাতভিত্তিক অর্থনীতি যথেষ্ট ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তনের সহনীয় অবস্থায় সামষ্টিক অর্থনীতিতে ভৌত সম্পদ এবং অর্থনৈতিক কার্যক্রমে প্রতি বছর জিডিপির প্রবৃদ্ধি ১.৩ শতাংশ হ্রাস পেতে পারে। এছাড়াও, স্বাস্থ্যগত ঝুঁকি বৃদ্ধি এবং জীব বৈচিত্র্যের ধ্বংসের ফলে অন্যান্য ব্যয় বেড়ে যাবে। জলবায়ু পরিবর্তনের চরম পর্যায়ে এ সকল ক্ষয়-ক্ষতি ও ব্যয় সমানুপাতিক হারে বেড়ে যাবে। ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ বাস্তবায়নে পানি, পরিবেশ, ভূমি, কৃষি (বন, প্রাণিসম্পদ এবং মৎস্য) ইত্যাদি খাতের কৌশল প্রণয়ন এবং যথাযথ বিনিয়োগ, নতুন নীতিমালা প্রণয়ন ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের প্রয়োজন হবে। ব-দ্বীপ

পরিকল্পনায় প্রস্তাবিত নীতি, বিনিয়োগ এবং প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারসমূহ সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সাথে সম্পর্কিত, ৯ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জন সংশ্লিষ্ট বিনিয়োগ, সামষ্টিক অর্থনৈতিক নীতি এবং সার্বিক ব্যবস্থাপনা সংস্কারের অতিরিক্ত হিসেবে কাজ করবে।

নতুন নতুন প্রকল্প বাস্তবায়ন এবং বিদ্যমান অবকাঠামোর উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ বাস্তবায়নে প্রতিবছর মোট দেশজ আয়ের প্রায় ২.৫ শতাংশ পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন হবে। বর্তমানে এ ব্যয় প্রতিবছর মোট দেশজ আয়ের মাত্র ০.৮ শতাংশ। বর্তমান বিনিয়োগ এবং বিদ্যমান দেশজ আয় ব্যবহার করে ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ সংক্রান্ত প্রকল্পের জন্য প্রাক-ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ ব্যয়ের মাত্রা ২০১৬ অর্থবছরের ১.৮ বিলিয়ন ইউএস ডলার থেকে বৃদ্ধি করে ২০৩০ সাল নাগাদ তা ২৯.৬ বিলিয়ন ইউএস ডলারে উন্নীত হবে।

ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ এর ধারণা অনুযায়ী মোট দেশজ আয়ের ২.৫ শতাংশের মধ্যে ০.৫ শতাংশ অর্থায়ন বিভিন্ন উদ্যোগের আওতায় বেসরকারি খাত হতে এবং প্রায় ২ শতাংশ সরকারি খাত হতে নির্বাহ করতে হবে। সরকারি খাত হতে প্রাপ্ত ২ শতাংশ মোট দেশজ আয়ের মধ্যে প্রায় ০.৫ শতাংশ রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা (O&M) খাতে ব্যয় করার পর অবশিষ্ট মোট দেশজ আয়ের ১.৫ শতাংশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ বিনিয়োগ পরিকল্পনার আওতায় ব্যয় করা হবে। উল্লেখ্য, বর্তমানে রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা খাত খুব অবহেলিত এবং এ ব্যয়ের প্রকৃত পরিমাণও দেশজ আয়ের ০.১ শতাংশের বেশি হবে না। ব-দ্বীপ পরিকল্পনায় রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা খাতে কাংখিত বিনিয়োগ না করা হলে পানিসম্পদ খাতে বিদ্যমান অবকাঠামোর স্থায়িত্বের দ্রুত অবনতি ঘটবে এবং পরবর্তীতে এ সকল অবকাঠামো অধিক ব্যয়ে পুনঃনির্মাণ করতে হবে।

(২) বিনিয়োগ অগ্রাধিকার

ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ তে চিহ্নিত বিনিয়োগ অগ্রাধিকার তালিকা ব্যাপক। উপরন্তু, বাস্তবায়ন সক্ষমতার সীমাবদ্ধতার কারণে বৃহৎ প্রকল্প প্রণয়ন এবং তা বাস্তবায়ন সীমিত হয়ে যাচ্ছে। তাই, প্রকল্প গ্রহণে অগ্রাধিকার নির্ধারণ করতে হবে। এটি গুরুত্বপূর্ণ যে, ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ এর প্রকল্পসমূহ শুধুমাত্র ভৌত বিনিয়োগ নয় বরং, অধিকতর গবেষণা, জ্ঞান এবং প্রাতিষ্ঠানিক সীমাবদ্ধতা উত্তরণেও উল্লেখযোগ্য বিনিয়োগের প্রয়োজন হবে।

ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ এর বেশিরভাগ সরকারি অর্থায়ন বন্যা থেকে রক্ষা, নদী ভাঙ্গন, নিয়ন্ত্রণ, নদী শাসন এবং নাব্যতা রক্ষাসহ সামগ্রিক নদী ব্যবস্থাপনা, নগর ও গ্রামে পানি সরবরাহ এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, নগরে বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন ব্যবস্থার মাধ্যমে নদী ব্যবস্থাপনা ইত্যাদির জন্য প্রয়োজন হবে। এগুলো অত্যন্ত পূর্জিঘন বিনিয়োগ। বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নদী ভাঙ্গন, নদী খনন, নদী শাসন এবং নৌ-পরিবহনসহ নদী ব্যবস্থাপনা বর্তমানে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত বিনিয়োগ খাত। এ খাতে বিনিয়োগের পরিমাণ মোট ব-দ্বীপ পরিকল্পনা বিনিয়োগের প্রায় ৩৫ শতাংশ। এছাড়া, দ্রুত বর্ধনশীল জনসংখ্যা ও অধিকতর অর্থনৈতিক কর্মকান্ড সম্বলিত প্রধান প্রধান নগরসমূহে পানি সরবরাহ, পয়ঃনিষ্কাশন, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং নিষ্কাশন ব্যবস্থা প্রভৃতি খাতে ব-দ্বীপ পরিকল্পনা বিনিয়োগ হতে কমপক্ষে ২৫ শতাংশ অর্থের প্রয়োজন হবে। অধিকন্তু, ছোট ছোট শহর ও গ্রামীণ এলাকায় বিদ্যমান পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়নে সরকারের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য ব্যাপক বিনিয়োগের প্রয়োজন রয়েছে। এক্ষেত্রে ২০৩০ সাল নাগাদ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ এর মোট বিনিয়োগের প্রায় ২০ শতাংশ প্রয়োজন হবে।

(৩) ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ এর বিনিয়োগ পরিকল্পনা

ব-দ্বীপ বিনিয়োগ পরিকল্পনায় যাচাই-বাছাই শেষে প্রথম পর্যায়ে বাস্তবায়নের জন্য মোট ৮০ টি প্রকল্প প্রস্তাব করা হয়েছে। তন্মধ্যে ৬৫ টি ভৌত অবকাঠামো সংক্রান্ত প্রকল্প এবং ১৫ টি প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা ও দক্ষতা উন্নয়ন এবং গবেষণা বিষয়ক প্রকল্প রয়েছে। এ সকল প্রকল্পে মোট মূলধন

বিনিয়োগ ব্যয় ২৯৭৮ বিলিয়ন টাকা (প্রায় ৩৭ বিলিয়ন ইউএস ডলার)। প্রস্তাবিত প্রকল্পগুলোর বাস্তবায়ন পরবর্তী আট বছরের মধ্যে বিভিন্ন বছরে শুরু করা যেতে পারে, যদিও বিনিয়োগের পরিমাণ ও কর্মসূচির প্রকৃতি অনুযায়ী কিছু ক্ষেত্রে বাস্তবায়ন পরবর্তী কয়েক দশকেও সম্প্রসারিত হবে।

উন্নয়ন অভিযোজি ব-দ্বীপ ব্যবস্থাপনা (Adaptive Delta Management- ADM) এর নীতি অবলম্বনে সমন্বিত ও ব্যাপক পরামর্শের ভিত্তিতে এবং অন্তর্ভূক্তিমূলক প্রক্রিয়া অনুসরণে বিশ্ব ব্যাংকের কারিগরী সহায়তায় ব-দ্বীপ বিনিয়োগ পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। এ বিনিয়োগ পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় পরিকল্পনা কমিশনের সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ (জিইডি) কর্তৃক পানিসম্পদ ব্যবহার ও ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পৃক্ত সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা থেকে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত মোট ১৩৩টি প্রস্তাব পাওয়া যায়। উক্ত প্রকল্পসমূহের জন্য প্রাক্কলিত মোট মূলধন ব্যয়ের পরিমাণ ৩,৭৫৩ বিলিয়ন টাকা (৪৭ বিলিয়ন ইউএস ডলার)। প্রাপ্ত প্রকল্প প্রস্তাবসমূহ অভিযোজি ব-দ্বীপ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি অনুসরণে যাচাই বাছাই শেষে শ্রেণিভুক্তি করে তাদের ক্রমবিন্যাসপূর্বক ৮০টি প্রকল্প বিনিয়োগ পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। একটি নির্দিষ্ট প্রকল্প অভিযোজি ব-দ্বীপ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা এবং তা ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ এর এক বা একাধিক অভীষ্ট অর্জনে সহায়ক কিনা তার ভিত্তিতে নিবার্চন করা হয়েছে।

(৪) সরকারি অর্থায়ন

বর্তমানে সরকার ব-দ্বীপ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত প্রকল্প এবং কর্মসূচিতে মোট দেশজ আয়ের ০.৮ শতাংশ ব্যয় করে, যেখানে প্রয়োজন মোট দেশজ আয়ের প্রায় ২ শতাংশ। এক্ষেত্রে সরকারি খাতে অতিরিক্ত মোট দেশজ আয়ের ১.২ শতাংশ অর্থায়নের উৎস খুঁজে বের করা সহজ নয়। এমনকি এ অতিরিক্ত অর্থ সংস্থানে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ এর সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামোতে অভ্যন্তরীণ সম্পদ সংগ্রহের বিষয়ে যে আশাবাদ ব্যক্ত করা হয়েছে তার সাথে কিছু সৃজনশীল প্রচেষ্টার প্রয়োজন হবে। ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ এর বিভিন্ন কল্পদৃশ্যে বর্ণিত জাতীয় উন্নয়ন কৌশলের বিপরীতে প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ সামগ্রিক সরকারি বিনিয়োগ কর্মসূচির অর্ন্তভূক্ত। কর হতে প্রাপ্ত অর্থ, সুবিধাভোগীদের নিকট হতে আহরিত অর্থ (Beneficiary Pay Principle), গ্রীন ক্লাইমেট ফান্ডসহ বৈদেশিক অর্থায়নের সমন্বয়ে সরকারি তহবিলের যোগান কৌশল নির্ধারিত হয়েছে। ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ এর সম্পদ সংগ্রহ কৌশল, অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক ঋণ সংগ্রহ কৌশল, আর্থিক ঘাটতি এবং অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক স্থায়িত্বের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট বিনিয়োগে ব-দ্বীপ ব্যবস্থাপনায় আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সর্বোত্তম অনুশীলন হিসেবে সুবিধাভোগীদের নিকট হতে অর্থ আদায়ের মাধ্যমে 'বিনিয়োগ ব্যয় পুনরুদ্ধার' নীতি প্রয়োগে জোর দেয়া হয়েছে । উদাহরণ স্বরূপ, ডাচ্ ডেল্টাতে বন্যা নিয়ন্ত্রণ, সেচ, পানি সরবরাহ, পয়ঃনিষ্কাশন এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনা খাতে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে এ নীতি প্রয়োগের মাধ্যমে অর্থায়ন করা হয়। ব্যয় পুনরুদ্ধার নীতি অনুসরণ করে এ সকল খাতে বিনিয়োগ ও রক্ষণাবেক্ষণের সম্পূর্ণ অর্থায়ন হওয়ার পাশাপাশি সেখানকার পানি ব্যবস্থাপনাও অধিকতর বিকেন্দ্রীকৃত। ডাচ্দের পানিসম্পদ খাতে বিনিয়োগের ৮০ শতাংশ ব্যয়সহ রক্ষণাবেক্ষণের শতভাগ ব্যয় স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার মাধ্যমে সম্পন্ন হয়ে থাকে। এ অর্থের বেশিরভাগ অংশ স্থানীয় পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠনগুলোর মাধ্যমে ব্যয় করা হয় ।

এ ক্ষেত্রে স্থানীয় পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠনগুলো অতি দরিদ্র গোষ্ঠীকে প্রয়োজনে ভর্তুকি প্রদান এবং 'সুবিধাভোগীদের নিকট হতে অর্থ আদায়ের মাধ্যমে বিনিয়োগ ব্যয় পুনরুদ্ধার' নীতির বাস্তবায়নে বেসরকারি সমবায় সমিতি হিসেবে কাজ করে। বাংলাদেশ ব-দ্বীপ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রেও অনুরূপ নীতি প্রয়োগের সুযোগ রয়েছে। বাংলাদেশের শহর এলাকায় পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা সংক্রান্ত রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রমে উল্লেখযোগ্য বরাদ্দ দেয়া হয়। কিন্তু এ ক্ষেত্রে 'সুবিধাভোগীদের নিকট হতে অর্থ আদায়ের মাধ্যমে বিনিয়োগ ব্যয় পুনরুদ্ধার' এর প্রচলন নেই। তাছাড়া, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় পুনরুদ্ধারও অতি নগণ্য। গতানুগতিকভাবে নগর পানি সরবরাহ, পয়ঃনিষ্কাশন এবং

বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় বিনিয়োগকৃত মূলধন পুনরুদ্ধারেরও প্রচলন নেই। বন্যা ব্যবস্থাপনা এবং সেচের ক্ষেত্রেও এ সকল ব্যয় পুনরুদ্ধার করা হয় না। এক্ষেত্রে স্থানীয় পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠনগুলোর অনুপস্থিতি একটি কারণ।

'সুবিধাভোগীদের নিকট হতে অর্থ আদায়ের মাধ্যমে বিনিয়োগ ব্যয় পুনরুদ্ধার' নীতির প্রয়োগ করা আবশ্যক। শহর এলাকায় পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশনের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানিক কাঠামো এবং বিধি-বিধান রয়েছে। এ বিধি-বিধানের যথাযথ প্রয়োগ প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে এমন একটি যুগোপযোগী নীতি গ্রহণ করা উচিত যাতে পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন সংশ্লিষ্ট সকল সরকারি সেবার রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় ক্রমান্বয়ে শতভাগ পুনরুদ্ধার করা যায়। সময়ের সাথে সাথে ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা ও রাজশাহী ওয়াসা থেকে শুরু করে অন্যান্য এলাকাতেও মূলধন ব্যয় পুনরুদ্ধারের কথা বিবেচনা করা যেতে পারে। কঠিন বর্জ্যের ক্ষেত্রে একটি আধুনিক সম্পদ কর ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা ও এর সাথে বার্ষিক ভিত্তিতে সেবার মূল্য যুক্ত করে ব্যয় পুনরুদ্ধার করা যেতে পারে। জলবায়ুর অভিঘাত প্রশমন এবং অভিযোজন কর্মসূচিতে অর্থায়নের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত গ্রীন ক্লাইমেট ফান্ড ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ এর অর্থায়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

বেসরকারি খাতে বিশেষ করে নবায়নযোগ্য শক্তি শিল্পকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকারি খাত মধ্যস্থতাকারীদের ব্যবহারে উল্লেখযোগ্য সাফল্য পেয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তন অভিঘাত মোকাবেলায় বেসরকারি উদ্যোগের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন সহায়ক পরিবেশ নিশ্চিত করার জন্য আরও অনেক কিছু করার প্রয়োজন রয়েছে। কার্যকর প্রচেষ্টার মাধ্যমে গ্রীন ক্লাইমেট ফান্ড হতে বাংলাদেশের প্রতিবছর ২.০ বিলিয়ন ইউএস ডলারের বেশি সহায়তা পাওয়ার উজ্জ্বল সম্ভাবনা রয়েছে।

(৫) বেসরকারি অর্থায়ন

বেসরকারি খাতের কার্যকর অংশগ্রহণ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ অর্থায়নে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখবে। ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ এর প্রাক্কলন অনুসারে পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনা ও সংশ্লিষ্ট অবকাঠামোগত প্রকল্পে অর্থায়নের জন্য বাংলাদেশের বেসরকারি খাত হতে প্রতি বছর মোট দেশজ আয়ের ন্যূনপক্ষে ০.৫ শতাংশ যোগান দেয়া সম্ভব হবে। বহি:বিশ্বের অভিজ্ঞতা হতে দেখা যায় যে, পানি পরিশোধন, পানি সরবরাহ এবং পয়:ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বেসরকারি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার চমৎকার সম্ভাবনা রয়েছে। এ ক্ষেত্রে আরো দু'টি সম্ভাব্য ক্ষেত্র হল সেচ এবং ড্রেজিং। ড্রেজিং কার্যক্রমে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে বেসরকারি খাতের যথেষ্ট আগ্রহ রয়েছে। ড্রেজিংয়ে প্রাপ্ত বালি-মাটি বিক্রি করে ড্রেজিং ব্যয় উল্লেখযোগ্য হারে কমানো যেতে পারে। তবে, এ ক্ষেত্রে কারিগরি বিষয়াদি এবং ঝুঁকি মোকাবেলায় সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা প্রয়োজন। ড্রেজিংয়ের জন্য যথাযথ চুক্তি ব্যবস্থা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক পর্যায়ের সর্বোত্তম চর্চা অনুসরণ করতে পারে।

ভূমি পুনরুদ্ধারে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব (পিপিপি) আরেকটি সম্ভাবনাময় ক্ষেত্র হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। পিপিপি অনুমোদন কাঠামোতে নদী খননের সাথে ভূমি পুনরুদ্ধারের সমন্বয় করা হলে তা বেসরকারি খাতের জন্য আকর্ষণীয় হবে। পিপিপি উদ্যোগের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন (আইডব্লিউটি) এর জন্য নদী বন্দর অবকাঠামো প্রতিষ্ঠা করাও সম্ভব।

ঞ. গভর্ন্যান্স ও প্রতিষ্ঠানসমূহ

সরকারি নীতি ও কর্মসূচির সুষ্ঠু বাস্তবায়ন বিদ্যমান গভর্ন্যান্স এবং অন্তর্নিহিত প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর ওপর নির্ভরশীল। যখন নীতি এবং কর্মসূচিসমূহের ধরণ ক্রস-সেক্টরাল এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহ এর সাথে সম্পৃক্ত হয় তখন এদের তাৎপর্যও বৃদ্ধি পায়। ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ মূলতঃ আন্তঃখাতভিত্তিক এবং এর বাস্তবায়নের সাথে কতিপয় মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, বিভিন্ন গোষ্ঠী এবং বেসরকারি খাতের সম্পৃক্ততা রয়েছে। ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ বাস্তবায়নে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর জন্য প্রয়োজন যথার্থ কর্মবন্টন, পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত কর্মসূচি এবং সমন্বিত প্রচেষ্টা।

কর্মসূচির আকার বিস্তৃত হওয়ায় তা বাস্তবায়নে অধিক সম্পদের প্রয়োজন, যদিও সম্পদ সীমিত এবং চাহিদার মাত্রাও ভিন্ন ভিন্ন। প্রতিযোগিতামূলক চাহিদা সমূহের মধ্যে সীমিত সম্পদের ভারসাম্যপূর্ণ বণ্টন এবং সর্বোত্তম ফলাফল লাভে কর্মসূচির কার্যকর বাস্তবায়ন এর সবকিছুই রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক বাস্তবতা, যা গভর্ণ্যান্সের ওপর অনেকাংশেই নির্ভরশীল।

বিশ্বের অন্যান্য ব-দ্বীপ পরিকল্পনার অভিজ্ঞতার আলোকে বাংলাদেশ তাদের বিদ্যমান পরিস্থিতি পর্যালোচনাপূর্বক ত্রুটি-বিচ্যুতি পরিহার করে তাদের ইতিবাচক অভিজ্ঞতাসমূহ গ্রহণ করতে পারে। উল্লেখ্য যে, ডেল্টা সংক্রান্ত চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বাংলাদেশের নিজেরই দীর্ঘ অভিজ্ঞতা রয়েছে। এসকল অভিজ্ঞতার একটি বস্তুনিষ্ঠ পর্যালোচনা, সাফল্য এবং দুর্বলতার ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিতকরণ ইত্যাদি ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ বাস্তবায়নের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

সময়ের সাথে সাথে বিবর্তিত হয় বলে প্রতিষ্ঠানসমূহ গতিশীল হয়। প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তনসমূহের বাস্তবায়ন আরও অগ্রসর হতে পারে এবং সামাজিক-রাজনৈতিক বাস্তবতার উপর ভিত্তি করে প্রায়োগিক সমাধান সম্বলিত সুচিন্তিত পরিকল্পনার মাধ্যমে জনপ্রশাসনের সার্বিক সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করা সম্ভব। এ মুহূর্তের চ্যালেঞ্জ হচ্ছে ন্যূনতম প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গড়ে তোলা, যা ছাড়া ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ বাস্তবায়ন বাঁধাগ্রস্ত হবে।

(১) বাংলাদেশের পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনার জন্য গভর্ন্যান্স সংক্রান্ত বিষয় এবং চ্যালেঞ্জ

পানিসংক্রান্ত প্রাকৃতিক ঝুঁকি মোকাবেলার অংশ হিসেবে পানি নীতি, প্রবিধান ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান সম্বলিত বাংলাদেশের পানি ব্যবস্থাপনার একটি দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। তবে খাদ্য নিরাপত্তা ও জীবিকা নির্বাহে কৃষি খাতের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কারণে পানি ব্যবস্থাপনার মূল লক্ষ্য ছিল কৃষি উৎপাদনে সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ। পানি ব্যবস্থাপনায় জলবায়ু পরিবর্তন, নৌ-পরিবহন, শহরাঞ্চলে পানি সরবরাহ এবং নদী ও অন্যান্য জলাশয়ের দূষণ এবং পয়:নিষ্কাশন প্রভৃতি বিষয়ে তেমন গুরুত্ব না দেয়ায় এ সকল ক্ষেত্রে নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে। ফলে এ বিষয়গুলো সমন্বিত ব-দ্বীপ ব্যবস্থাপনায় পরবর্তীতে আরও তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে। পানি সংশ্লিষ্ট আইনটি সাম্প্রতিক, তাই এর সাথে সংশ্লিষ্ট নীতি এবং নিয়ন্ত্রক প্রতিষ্ঠানসমূহ পুরোপুরি গড়ে উঠেনি। তবে এ আইন, সমন্বিত পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনার কার্যক্রম এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে একটি শক্তিশালী ভিত্তি প্রদান করেছে। পানি আইন ২০১৩, মূলতঃ জাতীয় পানি নীতি ১৯৯৯ এবং জাতীয় পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা ২০০১ এ উল্লিখিত নীতিমালা-কার্যক্রম অনুসরণ করে কাজ করবে।

ধারাবাহিকভাবে সরকার বিভিন্ন সময়ে আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞদের সাথে পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে বিস্তারিত গবেষণা করেছে। তবে আর্থিক, প্রাতিষ্ঠানিক এবং রাজনৈতিক সীমাবদ্ধতার কারণে বাস্তবায়ন আশানুরুপ হয়নি। এক্ষেত্রে প্রধান চ্যালেঞ্জ হল সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে স্থানীয় পানি ব্যবস্থাপনা সংস্থাসমূহ এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ অংশীজনের (সুবিধাভোগীদের) সক্রিয় অংশগ্রহণের অভাব। অপর্যাপ্ত প্রাতিষ্ঠানিক সমন্বয়ের কারণে উদ্ভূত পানি সংক্রান্ত বিষয়সমূহের সাথে জলবায়ু পরিবর্তন, পরিবেশ ও ভূমি ব্যবস্থাপনা এবং অন্যান্য ব-দ্বীপ সংক্রান্ত চ্যালেঞ্জগুলোর সমন্বয়হীনতা হচ্ছে আরেকটি বড় সমস্যা।

(২) ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ এর জন্য প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার

ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ বাস্তবায়নের জন্য নিম্নবর্ণিত তিনটি মূল লক্ষ্যের ভিত্তিতে প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার প্রয়োজন:

- আন্তঃখাতভিত্তিক পরিকল্পনা ও কর্মসূচি প্রণয়ন, সমন্বয় এবং পরিবীক্ষণের জন্য কার্যকর প্রতিষ্ঠান স্থাপন;
- জলবায়ু পরিবর্তন, পরিবেশ, জীব-বৈচিত্র্য সংরক্ষণ, কৃষি, মৎস্য, বনভূমি, অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন

ও ভূমি ব্যবস্থাপনা প্রভৃতি এবং পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনায় অন্তর্ভুক্ত করে ব-দ্বীপ সংক্রান্ত সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জগুলোর বিষয়ে একটি সুদূরপ্রসারি দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলা; এবং

- পানি, জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা, কৃষি ও ভূমি ব্যবস্থাপনা এবং অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত প্রতিটি প্রতিষ্ঠানকে আর্থিক এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা, কার্যকরী প্রতিষ্ঠান পরিচালন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন এবং জ্ঞান ব্যবস্থাপনা প্রভৃতি ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত কারিগরি দক্ষতা সম্বলিত শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানে রূপান্তর।

(৩) ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ এর আওতায় গভর্ন্যান্স ও প্রাতিষ্ঠান

৩.১ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০-এর বাস্তবায়ন সমন্বয় এবং পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ণ:

বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০-এর বাস্তবায়নে সার্বিক সহায়তাসহ সমন্বয়, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের দায়িত্ব বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশনের সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ (জিইডি)-এর ওপর অর্পনে সরকার নীতিগণভাবে সম্মত হয়েছে। এ দায়িত্ব সুষ্ঠু ও সুচারুভাবে সম্পাদনের জন্য জিইডির প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির প্রয়োজন হবে। এতদুদ্দশ্যে প্রয়োজনে জিইডিতে ভবিষ্যতে একটি অনুবিভাগ সৃষ্টি করা হবে ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ এর সঠিক বাস্তবায়নে রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত ও দিক নির্দেশনা প্রদানের জন্য 'ডেল্টা গভর্ন্যান্স কাউন্সিল (ডিজিসি)' নামে একটি উচ্চ পর্যায়ের কিন্ত ছোট পরিসরে ফোরামের প্রস্তাব করা হয়েছে, যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে এবং পরিকল্পনা মন্ত্রীর সহ-সভাপতিত্বে একটি তত্ত্বাবধায়ক ও নির্দেশক সত্তা হিসেবে কাজ করবে। ডিজিসি ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ এর বিষয়ে প্রাসঙ্গিক নির্দেশনা প্রদান এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। একইসাথে রাজনৈতিক অঙ্গীকার অর্জনের জন্য একটি আনুষ্ঠানিক যোগসূত্র হিসেবেও কাজ করবে। এটি কৌশলগত পরামর্শ এবং নীতি নির্দেশনা প্রদান করবে। জিইডি বিনিয়োগ কর্মসূচিসহ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা, সমন্বয় সাধন এবং সহায়তা প্রদান করবে। ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ এর বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও সংস্থার মাধ্যমে হবে। ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০-এর বিনিয়োগ কর্মসূচির জন্য প্রকল্প/কর্মসূচি যাচাই-বাছাইপূর্বক নির্বাচনের জন্য জিইডির সদস্য-এর নেতৃত্বে একটি আন্তঃমন্ত্রণালয়া 'প্রকল্প/কর্মসূচি নির্বাচন কমিটি (Project/Programme Selection Committee -PPSC)' গঠন করা হবে।

ব-দ্বীপ পরিকল্পনা সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ যেমন অর্থ বিভাগ, পরিকল্পনা বিভাগ, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, কৃষি মন্ত্রণালয়, ভূমি মন্ত্রণালয়, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি উক্ত কমিটিতে সদস্য হিসাবে অন্তর্ভুক্ত হবেন। সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ হালনাগাদকরণ, এর বিনিয়োগ কর্মসূচি প্রণয়ন, পরিবীক্ষণ এবং মূল্যায়নসহ প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট গবেষণা ও সমীক্ষা সম্পাদন করবে। তবে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিভাগ এবং সংস্থা নির্বাচিত প্রকল্প/কর্মসূচি বাস্তবায়ন করবে।

৩.২ বাংলাদেশ ডেল্টা তহবিল

বর্তমানে পানিসম্পদ খাতে সরকারি ব্যয়ের পরিমাণ মোট দেশজ আয়ের ০.৮ শতাংশ, যা ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ অনুসারে ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়ে ২০৩০ সাল নাগাদ ২.৫ শতাংশে উন্নীত হবে। সীমিত সম্পদ এবং সমন্বিত ব্যয় ব্যবস্থাপনার প্রয়োজনীয়তা চিন্তা করে এক্ষেত্রে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির বরাদ্দের সাথে একত্রিত করে ডেল্টা তহবিলের সূচনা করা হবে। ডেল্টা কর্মসূচি জিইডি কর্তৃক প্রতি বছর প্রণয়ন এবং হালনাগাদ করা হবে, যাতে বিনিয়োগ, রক্ষণাবেক্ষণ, গবেষণা, সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন ব্যয় অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

অনুমোদিত প্রকল্পসমূহের জন্য পূর্ণ মেয়াদে অর্থায়ন নিশ্চয়তা প্রদানসহ নতুন এবং চলমান প্রকল্পগুলোর মধ্যে বরাদ্দের ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে। পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় প্রাথমিকভাবে ডেল্টা তহবিল ও হতে নির্বাহ করা হবে। কিন্ত সময়ের সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট পৌরসভা এবং স্থানীয় পানি ব্যবস্থাপনা সংস্থাগুলোর কাছে পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব হস্তান্তর করা হবে। একইভাবে, সময়ের সাথে ডেল্টা তহবিল হতে শুধুমাত্র কিছু সংখ্যক জাতীয় উচ্চ প্রাধিকারভুক্ত

প্রকল্পে অর্থায়ন, উদ্ভাবন এবং গবেষণা ব্যয় নির্বাহ করা হবে। জাতীয় পর্যায়ের মানদন্ডের সাথে সংগতিপূর্ণ অপেক্ষাকৃত ছোট ছোট প্রকল্পসমূহের অর্থায়ন ও বাস্তবায়ন ক্রমান্বয়ে পৌরসভা ও স্থানীয় পানি ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করা যেতে পারে ।

৩.৩ স্থানীয় পানি ব্যবস্থাপনা সংস্থা

উপকূলীয় অঞ্চল, নদী, এবং জলাভূমি (হাওড় এবং বাওড়) প্রভৃতি ব্যবস্থাপনা, বড় সেচ প্রকল্প এবং বন্যা নিয়ন্ত্রণ সংশ্লিষ্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে সুবিধাভোগী অংশীজনের প্রতিনিধিত্ব আশানুরুপ নয়। ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ এর সফল বাস্তবায়নের জন্য পানি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে এই অনুপস্থিত সংযোগ প্রতিষ্ঠা একটি অপরিহার্য সংস্কার। এ পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠনসমূহকে সরকারি স্বার্থ নয় বরং অংশীজনের প্রতিনিধিত্ব করতে হবে। আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতার নিবিড় পর্যালোচনা, বাংলাদেশে পানি ব্যবহারকারী সমিতি প্রতিষ্ঠায় অনুসৃত দৃষ্টিভঙ্গির বিশ্লেষণ এবং ব্যর্থতার কারণ এবং আরো অধিক অংশীজনের পরামর্শের ভিত্তিতে এ পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠনসমূহ প্রতিষ্ঠিত হওয়া প্রয়োজন।

৩.৪ প্রধান প্রধান ডেল্টা প্রতিষ্ঠানসমূহ শক্তিশালীকরণ

ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ এর সফলতা এবং বাস্তবায়নের জন্য প্রধান প্রধান ডেল্টা প্রতিষ্ঠানসমূহ শক্তিশালী করা অত্যাবশ্যক। এটি একটি কঠিন চ্যালেঞ্জ, যা বাস্তবায়নে দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন। তবে এ ক্ষেত্রে কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান যেমন: জিইডি, ওয়ারপো, বাপাউবো, হাওড় এবং জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর, পরিবেশ অধিদপ্তর, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, মৎস্য অধিদপ্তর, এলজিইডি, বন বিভাগ, সংশিশ্লষ্ট সিটি কর্পোরেশন এবং পৌরসভা, ওয়াসা, নবগঠিত স্থানীয় পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠন এবং ডেল্টা সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের (কৃষি, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ, নৌ-পরিবহন, স্থানীয় সরকার, পরিবেশ ও বন এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়) অন্তর্ভুক্ত সকল বিশেষায়িত সংস্থাসমূহের প্রতি তাৎক্ষণিক দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন। পানিসম্পদ মন্ত্রণালয় হচ্ছে দেশের প্রধান পানি ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠান। বাপাউবো এবং ওয়ারপোসহ বেশ কিছু বিশেষ সংস্থার সহায়তায় এ মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম সম্পন্ন হয়। নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন, সমন্বিত পরিকল্পনা প্রণয়ন, গবেষণা, অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা এবং পরামর্শমূলক প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে উভয় প্রতিষ্ঠানকেই যথেষ্ট শক্তিশালী করা প্রয়োজন। বাপাউবোকে স্থানীয় পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠন প্রতিষ্ঠায় সহযোগিতা করতে হবে এবং একটি প্রতিযোগী প্রতিষ্ঠানের পরিবর্তে সম্পূরক প্রতিষ্ঠান হিসেবে তাদের সাথে সহকর্মীর মত কাজ করতে হবে। সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, ওয়ারপো এবং বাপাউবো'র যথাযথ সহায়তা ও সমন্বয়ের মাধ্যমে এ প্রক্রিয়াটি সহজ এবং কম ব্যয়বহুল হতে পারে।

৩.৫ আন্তঃসীমান্ত সংলাপ এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে শক্তিশালীকরণ

নদী তীরবর্তী ভাটির দেশ হিসেবে বাংলাদেশ উজানের দেশসমূহের পানি ব্যবস্থাপনা অবকাঠামো নির্মাণে সংশ্লিষ্ট উন্নয়ন কর্মকান্ডের প্রভাবে কিছু বাস্তব ঝুঁকির সম্মুখীন হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে উদ্ভাবনী সমাধানের জন্য কূটনৈতিক এবং প্রায়োগিক দক্ষতা উভয়ই প্রয়োজন। সুচিন্তাপ্রসূত বহুমুখি নদী অববাহিকা প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে এই দক্ষতার বিকল্প নেই। তদনুযায়ী, যৌথ নদী কমিশনের (জেআরসি) সক্ষমতা বাড়াতে হবে। বাপাউবো, ওয়ারপো, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সাথে জেআরসি'র অংশীদারিত্ব এবং আন্তঃসমন্বয় জোরদার করতে হবে। নদী তীরবর্তী দেশগুলোর সাথে সংলাপের জন্য পটভূমি চর্চা (Background Exercise) হিসেবে সম্ভাব্য বহুমুখি কারিগরি বিকল্পসমূহ এবং এদের তুলনামূলক ব্যয়-সুবিধা বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। মত বিনিময়, সদ্ভাব বজায় রাখা এবং সাধারণ উদ্দেশ্যে উদ্বেগ / অভিযোগ এবং তথ্য বিনিময়ের মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের পথ খুঁজে বের করতে নিয়মিত সংলাপকে কৌশলগত সংলাপে রুপান্তর করতে হবে।

৩.৬ ডেল্টা নলেজ ব্যাংক ও তথ্য ব্যবস্থাপনা

অভিযোজিত ডেল্টা ব্যবস্থাপনার উদ্যোগ গ্রহণের একটি অপরিহার্য পূর্বশর্ত হচ্ছে একটি ডেল্টা নলেজ ব্যাংক গড়ে তোলা। জিইডি ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করে এ নলেজ ব্যাংক গড়ে তুলবে এবং নিম্নবর্ণিত তিনটি প্রধান উদ্দেশ্যে একটি নলেজ ইউনিট তৈরী করবে:

- **জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে লব্ধ ডেল্টা সম্পর্কিত প্রাসঙ্গিক জ্ঞান সংকলন করে একটি ডিজিটাল নলেজ লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা;**
- **ডেল্টা উপাত্ত ব্যাংক স্থাপন; এবং**
- **সমন্বিত ডেল্টা জ্ঞান এবং উপাত্ত হালনাগাদকরণ, উন্নয়ন এবং বাস্তবায়ন।**

জিইডি একটি নলেজ ব্যাংক গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে বিদ্যমান জ্ঞানের পর্যালোচনা করবে। প্রাপ্ত জ্ঞান ও তথ্যের অধিকতর সমৃদ্ধির জন্য নলেজ ব্যাংকে মজুদকৃত জ্ঞানের সার-সংক্ষেপ ডেল্টা সম্পর্কিত অন্যান্য সরকারি ও বেসরকারি নীতি এবং গবেষণা প্রতিষ্ঠানের মতামত নেয়া প্রয়োজন। ডেল্টা ব্যবস্থাপনার জন্য প্রয়োজনীয় চাহিদার সাথে সংগতি এবং প্রাসঙ্গিকতা যাচাই, বিশেষত ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ এর সুষ্ঠু পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন, বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণপূর্বক ৩-৫ বছরের উপাত্ত এবং গবেষণা কর্মসূচি প্রণয়ন প্রভৃতি কার্যক্রম জিইডি কর্তৃক নিবিড়ভাবে পর্যালোচনা করা হবে। এ লক্ষ্যে সম্পদ বরাদ্দের প্রয়োজন হবে। জিইডিকে উপাত্ত সংক্রান্ত বিষয়ে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো ও ডেল্টা সম্পর্কিত অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের সাথে যৌথভাবে কাজ করতে হবে।

৩.৭ পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন

সরকারি নীতি ও কর্মসূচির পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন পরিচালনা পদ্ধতির সাথে বাংলাদেশের নীতি পরিকল্পনার একটি নিবিড় সংযোগ স্থাপন প্রয়োজন। পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের ক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য। অভিযোজিত ডেল্টা ব্যবস্থাপনা প্রেক্ষাপটে ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ এর সুষ্ঠু বাস্তবায়নের জন্য একটি কার্যকর পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ব্যবস্থা গড়ে তোলা অপরিহার্য। বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও বাস্তবায়নকারী সংস্থা যথারীতি উন্নয়ন প্রকল্পের পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের দায়িত্ব পালন করবে। তবে, ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ এর সামগ্রিক পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন জিইডি'র একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হবে। ডেল্টা নলেজ ব্যাংক প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়া অনুসরণে জিইডি ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ এর পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সংশ্লিষ্ট জ্ঞানভিত্তিক অংশীদারের কারিগরী দক্ষতার সহায়তা গ্রহণ করতে পারে। বলা বাহুল্য যে, প্রকল্প ও সেক্টর পর্যায়ে বিশ্লেষণের ওপর ভিত্তি করে এবং ডেল্টা সংক্রান্ত বিষয় যেখানে সব আন্তঃমন্ত্রণালয় সংস্থা এবং বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ সম্পৃক্ত তাদের পরামর্শক্রমে ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ এর পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সম্পন্ন হওয়া দরকার।

৩.৮ তথ্য ও জ্ঞান ব্যবস্থাপনা এবং দৃষ্টিভঙ্গি

ডেল্টা সংক্রান্ত বিষয়ে ব্যাপক জ্ঞান আহরণ এবং অভিযোজিত ডেল্টা ব্যবস্থাপনার পদ্ধতিতে তথ্য ও জ্ঞান ব্যবস্থাপনা এবং দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। **এ দৃষ্টিভঙ্গির পাঁচটি উপাদান নিম্নরুপ:**

- **জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা এবং বিষয়সূচি:** জ্ঞান বিষয়সূচি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা প্রশ্নের পাশাপাশি কতিপয় প্রধান বিষয় চিহ্নিত করে।
- **জ্ঞান আহরণ:** ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ প্রণয়নকল্পে সম্পাদিত ২৬টি বেসলাইন সমীক্ষা সংকলনের মাধ্যমে জ্ঞান আহরণের কার্যক্রম শুরু হয়েছে। এই সমীক্ষাগুলো হালনাগাদ করা ছাড়াও জ্ঞানের অপর্যাপ্ততা নির্ধারণপূর্বক নতুন ক্ষেত্র চিহ্নিত করে গবেষণা সম্পাদন করতে হবে।

- **জ্ঞান লভ্যতা:** একটি ওয়েব ভিত্তিক তথ্য পোর্টাল, ভৌগোলিক উপাত্তের স্তর বিন্যাস গবেষণা, সমীক্ষা নীতি সংক্রান্ত দলিল এবং অন্যান্য কারিগরি প্রতিবেদনের ভিত্তিতে জ্ঞানের লভ্যতা নিশ্চিত করা হবে।

- **উপযোগিতা নিশ্চিতকরণ:** ডেল্টা নলেজ ব্যাংক -এর ব্যবহার শুরু হলে ক্রমান্বয়ে এর উপযোগিতা বৃদ্ধি পাবে। উদাহরণস্বরূপ, ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং জলবায়ু বিষয়ক মানচিত্র প্রস্তুত অথবা জ্ঞান এবং বৈজ্ঞানিক ফলাফল দ্বারা সূচিত প্রাসঙ্গিক নীতি প্রণয়নে এটিকে উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে।

- **ডেল্টা জ্ঞানভিত্তিক কমিউনিটি:** শিক্ষাবিদ, নীতি নির্ধারক, উন্নয়ন সহযোগি, এনজিও এবং মাঠ কর্মীগণ এই কমিউনিটির অন্তর্ভুক্ত। ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করে এ কমিউনিটি তার অংশীজনের কাছে সংশ্লিষ্ট জ্ঞান সহজলভ্যকরণের মাধ্যমে তাদেরকে অভিযোজি ডেল্টা ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পৃক্ত করতে সমর্থ হবে।

ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ পর্যালোচনা এবং হালনাগাদকরণ

ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ একটি অভিযোজি এবং দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা হওয়ায় এটিকে দেশের পরিকল্পনা প্রক্রিয়ার সাথে সমন্বিত করা প্রয়োজন। এ পরিকল্পনা সময়ে সময়ে এবং নিয়মিতভাবে পর্যালোচনা করা হবে এবং পরবর্তী পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাসমূহে প্রতিফলন করা হবে। অধিকন্তু এ পরিকল্পনার আরো সমৃদ্ধির জন্য তাতে নতুন জ্ঞান এবং প্রযুক্তির সমাবেশ ঘটানোর প্রয়োজন হবে। ভবিষ্যতে এর সুষ্ঠু বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন হবে প্রতিনিয়ত পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ।

--- X ---

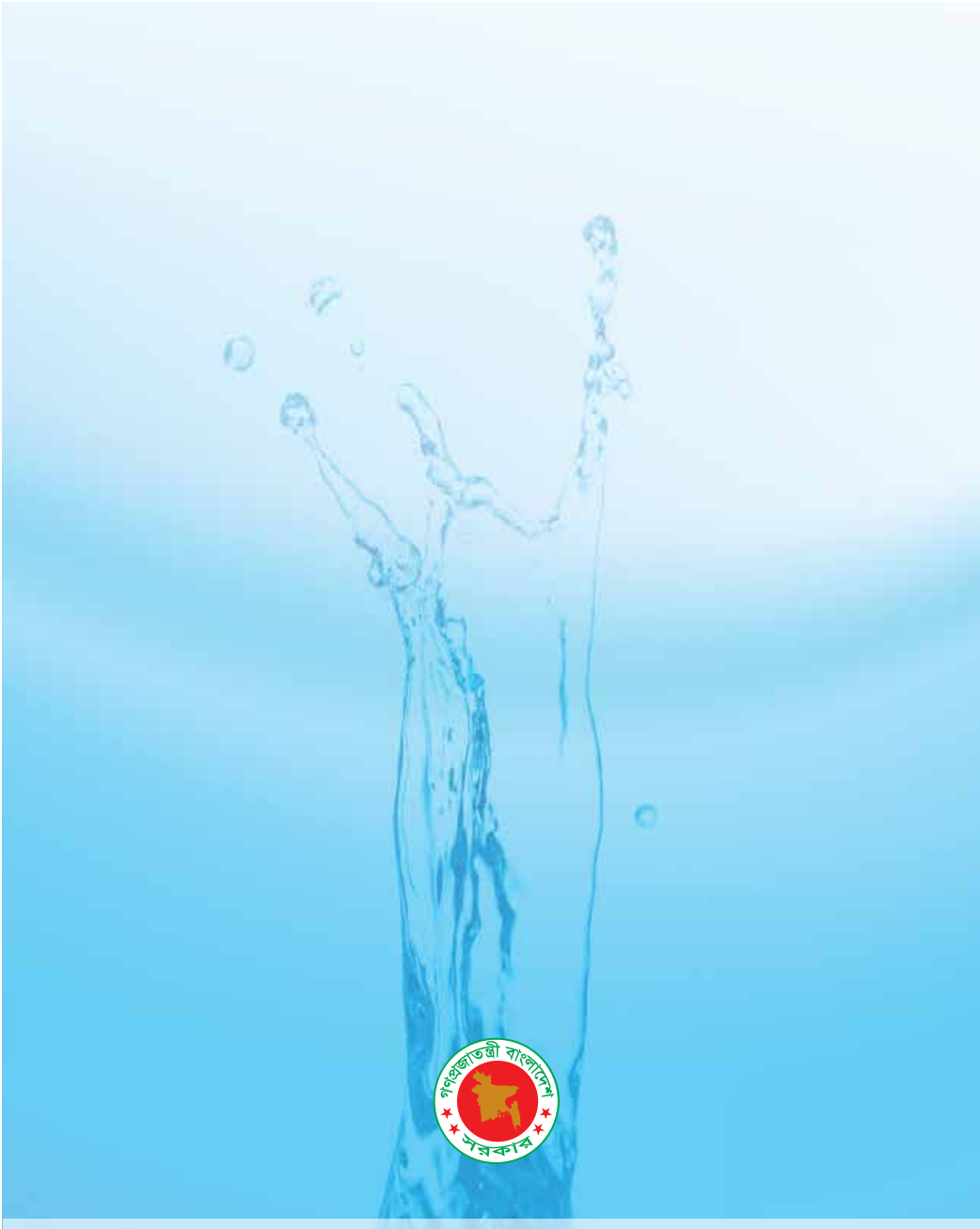

সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ (জিইডি)

বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

অক্টোবর ২০১৮